ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৬
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১৩

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৬

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : **অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১৩**

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, লেখক ও গবেষকবৃন্দ, ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানানো যাচ্ছে যে, সংস্থার ফোন নাম্বার বদল হয়েছে। বর্তমান নাম্বার : ০২-৯৫৭৬৭৬২

সংস্থার ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে

web: www.ilrcbd.org ভিজিট করুন এবং মতামত দিন।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সম্পাদকীয়

একজন মুসলিমকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। আর সেজন্য ইসলামের আদেশ-নিষেধ জানার লক্ষ্যে সব সময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। বিশেষত আধুনিক যুগে মানুষের জীবন যখন অসংখ্য মত ও পথের মিশ্রণে জটিল রূপ ধারণ করেছে তখন নির্ভেজাল ইসলামের পথে চলা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই তাকে আরো সতর্কভাবে জানার চেষ্টা করতে হয়। তার এই চেষ্টায় সহযোগিতা করার লক্ষ্যে 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালটি কাজ করে যাচ্ছে। জার্নালটির বর্তমান সংখ্যায় সাতটি গুরুতপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠকদের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

আধুনিক যুগে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে না এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে মুসলিম বিশ্বে কিছু ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা সুদী ব্যাংকের রীতি-পদ্ধতি পরিহার করে ইসলামী নিয়ম-নীতিতে চলার চেষ্টা করছে। এজন্য আধুনিককালে অর্থনীতি ও ব্যাংক-বীমা বিষয়ের মুসলিম পণ্ডিতগণ তাদের মেধা ও শ্রম ব্যয় করছেন সঠিক ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংক-বীমা চালুর জন্য। তাই বিভিন্ন দেশের ইসলামী গবেষকগণ এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দিক ও নিয়ম-পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং কতটুকু গ্রহণযোগ্য নয় সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরছেন।

'সুকূক' তেমনি একটি বিষয় যা বর্তমান সময়ে ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের জগতে বহুল আলোচিত। দু'জন গবেষক বিষয়টির অতীত ইতিহাস ও বর্তমানে এর প্রয়োগের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। অতীতে ইসলামী অর্থনীতিতে এ পদ্ধতি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বর্তমানে তা কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কীভাবে হলে তা ইসলামী পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হয়, তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

'সুকূক' বিষয়টির আলোচনা আমাদের দেশে একেবারেই নতুন। তাই সাধারণ পাঠকদের কাছে বিষয়টি একটু জটিল হওয়ারই কথা। তবে দু'জন লেখক কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে 'সুকূক' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করার পর 'সুকূক' ইস্যুকরণ,

বিনিময়, লাভ-ক্ষতি বণ্টন ও সমাপ্তিকরণের শরয়ী নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং বর্তমান সময়ের জন্য "সুকূক ইস্যুকরণ ও এতে বিনিয়োগের শরয়ী নীতিমালা : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ" শিরোনামের লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'রিবা' অর্থ সুদ। সুদ একটি অমানবিক আর্থিক লেনদেন পদ্ধতি। এর জন্ম ইতিহাস অতি অর্থলোভী ইহুদী জাতির সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম পূর্বযুগে জাহিলী আরবসহ গোটা পৃথিবীতে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইসলাম ধাপে ধাপে এ আর্থিক পদ্ধতি হারাম ঘোষণা করে। আল-কুরআনে ঘোষিত হলো- "আল্লাহ্ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং রিবা তথা সুদকে করেছেন হারাম তথা অবৈধ"। (আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫)

তখন মক্কার পৌত্তলিক বুদ্ধিমানরা বলেছিল, ব্যবসা তো সুদেরই মত। ব্যবসা হালাল হলে সুদ হারাম হবে কেন? তখনই তারা সুদ ও ব্যবসায়ের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করেনি। ধরে নিলাম তারা ছিল অজ্ঞ, জাহিল, তাই তারা সুদ ও ব্যবসার পার্থক্য বুঝতে পারেনি। কিন্তু আধুনিক যুগে যখন আমরা নিজেদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত বলে দাবি করি তখনও তো সুদ ও ব্যবসায়ের পার্থক্য না বুঝার ভান করি। আর সুদকে যারা হারাম ও অমানবিক বলে বিশ্বাস করেন, তাদেরও অনেকে সুদকে কয়েক প্রকারে ভাগ করে কোন কোন প্রকারকে হালাল এবং কোন কোন প্রকারকে হারাম মনে করেন। 'ইসলামী বাণিজ্যিক আইনে রিবা'র পরিধি' শিরোনামের প্রবন্ধটিতে রিবা' হারাম হওয়ার প্রেক্ষাপট, রিবা'র প্রকার, মনীষীদের মতামত রিবা'র ক্ষতি ইত্যাদি বিষয় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটির উপসংহারে বলা হয়েছে, সুদ একটি সামাজিক ব্যাধি, সুদী মানসিকতা ও মানবিকতা পরস্পর বিরোধী, একটির উপস্থিতি অপরটির মৃত্যু ডেকে আনে। এসব বিষয় সামনে রেখে আল্লাহ ও তার রাসূল সা. সুদের ওপর নিরঙ্কুশ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, এমনকি এ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন সুস্পষ্ট যুদ্ধ। সুতরাং সুদকে বৈধতা দেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই মানুষ ভ্রমণ করে আসছে। নানা কারণে মানুষ ভ্রমণ করে। আল-কুরআনে "সীরু ফিলআরদি" অর্থাৎ "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর" (আল-কুরআন, ৬ : ১১; ২৭ : ৬৯; ২৯ : ২০; ৩০ : ৪২) বলে মানুষকে ভ্রমণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় মানুষের জন্য ভ্রমণের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু একজন ভ্রমণকারী যখন নিজের বাসস্থান থেকে বেরিয়ে পড়ে তখন সে থাকা, খাওয়া, স্বাস্থ্য সেবা,

নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে একান্তই পরনির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। এ কারণে ইসলামী শরীয়তে তাদের বেশ কিছু অধিকার দেয়া হয়েছে। যেমন যাকাত দানের আটটি খাতের মধ্যে একটি হলো 'ইবনুস সাবীল' বা ভ্রমণকারী। ভ্রমণকারী ও তার বিভিন্ন সমস্যা এবং অধিকার বিষয় আলোচিত হয়েছে 'ইসলামে সফরের বিধান ও মুসাফিরের সামাজিক নিরাপত্তা' শিরোনামের প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধে ভ্রমণকারীর সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে ইসলামের গৃহীত ব্যবস্থার একটি চমৎকার পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

মানুষের আয়-রোজগারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ব্যবসা-বাণিজ্য। যে জাতি বা ব্যক্তি যত বেশি এই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়, অর্থনৈতিকভাবে সে তত বেশি এগিয়ে যায়। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং তা হালাল ও হারাম দুভাগে ভাগ করেছে। প্রথমটির ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহ যুগিয়েছে, আর দ্বিতীয়টির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মানুষ যাতে ব্যবসায়ে হারাম পদ্ধতিতে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্য অনেক বিধি-বিধান প্রদান করেছে। 'ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল-হারাম পদ্ধতি' শীর্ষক প্রবন্ধে সেই বিধি-বিধানগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

ইসলামী জীবনবিধানে নারী ও পুরুষের মর্যাদা সমান। প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা পুরুষের পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে চলেছে। বর্তমান বিশ্বেও নারীদের সফল পদচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হচ্ছে। বিচারক হিসেবেও তারা দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, ইসলামী বিধান মতে নারীর বিচারকের পদে আসীন হওয়া বৈধ কি-না এবং ইসলামের ইতিহাসে কোন নারীর বিচারক হওয়ার নজীর আছে কিনা? বিষয়টি নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিককালের ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। 'বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় পাঠকগণ তাদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।

ইসলামী সরকার ব্যবস্থার একটি অতি মর্যাদাপূর্ণ দফতর হল বিচার বিভাগ বা কাযা। রাসূলুল্লাহ স. ও আবু বকরের রা. আমলে পৃথক ভাবে এ দফতরটি ছিল না। প্রসিদ্ধ মতে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এ দফতরটি সৃষ্টি হয় উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফতকালে। উমরের রা.

খিলাফতকালে রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির সাথে ইসলামের প্রসারও ঘটে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর লোকদের সাথে মুসলিমদের মেলামেশা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেড়ে যায়। খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের ওয়ালীগণের উপর কাজের চাপ এবং জনগণের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় বিচার বিভাগের উন্নয়নের বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে উমর রা. শাসন কর্তৃত্বের বিভিন্ন দিক ও শাখাকে পৃথক করে বিচার ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র একটি বিভাগে পরিণত করেন।

উমর রা. যায়েদ ইব্‌ন সাবিতকে রা. মদীনার কাযী নিয়োগ করেন। তখন পর্যন্ত বিচারকের জন্য পৃথক আদালত ভবন নির্মিত হয়নি। যায়েদের রা. বাড়িই ছিল দারুল কাযা বা বিচারালয়। ঘরের মেঝেতে ফরাশ বিছানো থাকতো। তিনি তার উপর মাঝখানে বসতেন। রাজধানী মদীনা ও তার আশেপাশের যাবতীয় মামলা-মোকদ্দমা যায়েদের রা. এজলাসে উপস্থাপিত হতো। এমন কি তৎকালীন খলীফা খোদ উমরের রা. বিরুদ্ধেও এখানে মামলা দায়ের হয়েছে এবং তার বিচারও হয়েছে। 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর আমলে বিচার ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে উমর রা.-এর খিলাফতকালে বিচার ব্যবস্থার নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে তাঁর সময়ের বিচার ব্যবস্থার একটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

জার্নালটির এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে 'ওসিয়্যাত : ইসলামী শরীআতের আলোকে একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ। ওসিয়্যাতের মাধ্যমে বিত্তশালী ব্যক্তি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যেমন কারো কোন উপকার করতে পারেন, তেমনি পারেন অনেক সময় এর মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সামাজিক কাজ সম্পন্ন করতে। এ জন্য ইসলামী শরীআতে ওসিয়্যাতের আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে ওসিয়্যাত বিষয়ে ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধান উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখাটি এ বিষয়ে পাঠকদের জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটাবে।

পাঠকদের নিকট সঠিক ইসলামী জ্ঞান তুলে ধরার আমাদের এ প্রয়াস আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করুন এবং অব্যাহত রাখুন। আমীন!

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৬
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৩

সুকূক ইস্যুকরণ ও এতে বিনিয়োগের শরয়ী নীতিমালা : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান*
মুহাম্মদ রুহুল আমিন**

[**সারসংক্ষেপ :** *সুকূক বর্তমান সময়ে ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের জগতে বহুল আলোচিত একটি নাম। সুকূক ইস্যুকরণ, বিনিয়োগ ও এর পরিসমাপ্তি, লাভ-ক্ষতি বন্টন ইত্যাদি বিষয় শরীয়াহসম্মত হওয়ায় এটি কনভেনশনাল বন্ড থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র একটি বিনিয়োগ দলিলে পরিণত হয়েছে। সুকূক বিষয়ক শরীয়াহ নীতিমালার প্রাথমিক আলোচনা উপস্থাপনই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতিতে সুকূকের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, বন্ড ও শেয়ারের সাথে এর পার্থক্য, সুকূক ইস্যুকরণের প্রক্রিয়া, ইসলামিক সিকিউরিটাইজেশন, কনভেনশনাল ও ইসলামী সিকিউরিটাইজেশনের পার্থক্য, সুকূক ইস্যুকরণে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ, ইস্যুকরণের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি, এর গঠন-কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চিত্র ও সারণির মাধ্যমে আলোচনা স্পষ্ট করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সবশেষে সুকূক ইস্যুকরণ, বিনিময়, লাভ-ক্ষতি বন্টন ও সমাপ্তিকরণের শরয়ী নীতিমালা বিধৃত হয়েছে।*]

ভূমিকা

নির্দিষ্ট কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে অর্থায়নের জন্য সম্পদ সমারোহ ও বিনিয়োগ আকর্ষণে বন্ড বা বিনিয়োগপত্র ইস্যুকরণ একটি সফল পদ্ধতি। অর্থনৈতিক সম্পদকে হস্তান্তরযোগ্য কাগুজে সনদে রূপান্তরের মাধ্যমে এ জাতীয় বিনিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়। সুদভিত্তিক কনভেনশনাল ব্যাংক ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে শরীয়াহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর কনভেনশনাল বিনিয়োগপত্রের ইসলামী বিকল্প উদ্ভাবন জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ সুকূক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ইসলামী ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের সুবাদে সুকূক বর্তমানে অতি পরিচিত একটি আর্থিক দলিল।

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া।
** পিএইচ.ডি গবেষক, ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া।

ব্যাংকিং সেবার বাইরে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহের নিমিত্তে ব্যবহৃত সফল ইসলামী বিনিয়োগপত্র হিসেবে সুকূক ইতোমধ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। শুধুমাত্র মুসলিম বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সুকূকের গ্রহণযোগ্যতা সীমিত নয়। বরং অমুসলিম বিনিয়োগকারীগণও এর প্রতি আগ্রহী হওয়ায় বর্তমান সময়ে অমুসলিম দেশেও সুকূক ইস্যুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সিকিউরিটাইজেশন (Securitization) -এর কনভেনশনাল ধারণাকে কাজে লাগিয়ে একে শরীয়াহসম্মত করণের মাধ্যমে সুকূক ইস্যুর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইসলামিক সিকিউরিটাইজেশনে ইসলামী শরীয়াহকে প্রধান প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করায় কনভেনশনাল ও ইসলামিক সিকিউরিটাইজেশনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য তৈরি হয়। এ কারণে সুকূক ইস্যুর শুরু থেকে এর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যথাযথভাবে শরীয়াহ পরিপালন আবশ্যক। একদিকে যেমন ইসলামী বাণিজ্যিক আইনে স্বীকৃত কোন একটি 'আকদ বা চুক্তির আলোকে সুকূকের রূপায়ণ করতে হয়। অন্যদিকে তেমন সুকূক ইস্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যকার সম্পর্কসমূহ অবশ্যই শরয়ী ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হয়। বিশেষত সুকূকের মূল ইস্যুকারী (Originator) ও সুকূক ইস্যুর জন্য গঠিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠান (Special purpose vehicle-SPV) এর মধ্যকার সম্পর্ক কোনভাবেই যেন শরয়ী নীতিমালা বহির্ভূত না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হয়। সেকেন্ডারি মার্কেটে কনভেনশনাল সিকিউরিটিস যেভাবে লেনদেন হয় শরয়ী বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী সিকিউরিটিস তথা সুকূক সেভাবে লেনদেন হয় না।

সুকূক একটি সমসাময়িক পরিভাষা হলেও ইসলামী অর্থব্যবস্থার ইতিহাসে সমজাতীয় বিভিন্ন কাগুজে মালিকানাপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উমাইয়া শাসনামলে, বিশেষত মারওয়ান ইবনুল হাকাম [০২-৬৫হি.] মদীনার শাসনকর্তা থাকার সময়কালে প্রচলিত সুকূক আল-বাদাঈ' (صكوك البضائع) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামী শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে সুকূকের আরও একটি প্রয়োগ দেখা যায় উসমানী খিলাফাতে। ১৭৭৫ সালে উসমানী সালতানাত রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হলে এর বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য তামাক ভিত্তিক সিহাম[১] নামে বন্ড ইস্যু করে। প্রক্রিয়াগত দিক থেকে উসমানী খিলাফাতের ইস্যুকৃত এ বিনিয়োগপত্রটি ছিল সুকূকের আদলে, যদিও এক্ষেত্রে সুকূক শব্দের পরিবর্তে সিহাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল ।[২]

---

১. সিহাম : সাহ্ম শব্দের বহুবচন। এর অর্থ শেয়ার বা অংশ।

২. Asyraf Wajdi Dusuki (edited), *Islamic Financial System Principles & Operations*, Kuala Lumpur : International Shariah Research Academy for Islamic Finance, 2011, pp. 392, 395.

সুকূকের শাব্দিক অর্থ

সুকূক শব্দটি (صكوك) ফারসী জাক (صك) শব্দ থেকে আরবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। শব্দটি বহুবচন, যার একবচন সাক্কুন (صك)। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ মৃদু আঘাত করা। মহান আল্লাহ বলেন :

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

"তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে আসল এবং গাল চাপড়িয়ে বলল, এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হবে!"[৩]

শব্দটির আভিধানিক অর্থ আঘাত করা হলেও ব্যবহারগত দিক থেকে শব্দটি 'প্রতিশ্রুতিপত্র' অর্থ প্রদান করে। ইবনে মানযূর (৬৩০-৭১১ হি.) দেখিয়েছেন, সাক শব্দটির বহুবচন সুকূক ও সিকাক। শাসকবর্গের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের খাদ্য ও অন্যান্য অধিকারের স্বীকৃতি সম্বলিত রেশন কার্ডকে সিকাক বলা হয়। কেননা তা লিখিতভাবে প্রদান করা হয়।[৪] শাব্দিক ও ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে এভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় যে, লিখিত ঐ স্বীকৃতিপত্রকে সুকূক বলা হত, কারণ তাতে কলমের আঁচড় বা মৃদু আঘাত থাকত।

এ অর্থে হাদীসে শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ইমাম মুসলিম রহ.(২০৬-২৬১ হি.) বর্ণনা করেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا. فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا.

"আবূ হুরায়রা রা. (হি.পূর্ব ১৯-৫৭ হি) মারওয়ানকে বললেন, আপনি সুদের ব্যবসা বৈধ করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, আমি কী করেছি? আবূ হুরায়রা রা. বললেন, আপনি সিকাক বেচাকেনা বৈধ করেছেন; অথচ রাসূলুল্লাহ স. খাদ্যশস্য হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তা বেচাকেনা থেকে নিষেধ করেছেন। অতঃপর মারওয়ান ভাষণ প্রদান করলেন এবং এর বেচাকেনা নিষিদ্ধ করলেন।"[৫]

'সিকাক'-এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, "সিকাক শব্দটি সাক্কুন এর বহুবচন। যা দ্বারা লিখিত ঋণপত্র বুঝায়। এর বহুবচন সুকূকও ব্যবহৃত হয়। এখানে সিকাক দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ প্রতিশ্রুতিপত্র যা শাসকের পক্ষ থেকে খাদ্যদ্রব্য

---

৩. আল-কুরআন, ৫১ : ২৯

৪. মুহাম্মদ ইবনু মুকরিম ইবনি মানযূর আফ্রিকী, *লিসানুল আরব*, কায়রো : দারুল মা'আরিফ, খ. ৪, পৃ. ২৪৭৫

৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : বুতলানু বাই'য়িল মাবিই কাবলাল কাবযি, বৈরূত, খ. ৫, পৃ. ৯, হাদীস নং-৩৯২৬

পাওয়ার হকদারের জন্য ইস্যু করা হত এবং তাতে লেখা থাকত অমুকের জন্য এই এই খাদ্য।"[৬]

ইমাম মালিক রহ. (৯৩-১৭৯ হি.) প্রণীত মুয়াত্তায় সরাসরি 'সুকূক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন :

أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالا أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالا هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا.

"মারওয়ান ইবনুল হাকামের শাসনামলে খাদ্যদ্রব্যের সুকূক ইস্যু করা হত; কিন্তু লোকজন খাদ্য হস্তগত করার পূর্বেই উক্ত সুকূক নিজেদের মধ্যে বেচাকেনা করত। তখন যায়েদ ইবনু সাবিত (মৃ. ৪৫হি.) ও অন্য একজন সাহাবী মারওয়ান ইবনুল হাকামের দপ্তরে প্রবেশ করে বললেন, "হে মারওয়ান! তুমি কি সুদের বেচাকেনা বৈধ করেছ? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, সেটা কী? তখন তাঁরা দুজন বললেন, এই সুকূক তুমি মানুষের কাছে বিক্রয় করছ, অতঃপর তারা তাদের প্রাপ্য করায়ত্ত করার পূর্বেই পরস্পরের মধ্যে তা বিক্রি করছে। এরপর মারওয়ান তত্ত্বাবধায়কদের প্রেরণ করে লোকজনের কাছ থেকে সুকূক নিয়ে নিলেন এবং সেগুলো এর প্রকৃত মালিককে দিয়ে দিলেন।"[৭]

অতএব সুকূক শব্দটির অর্থ, প্রাপ্য সম্পদের স্বীকৃতিপত্র বা কোন কিছুর মালিকনায় অধিকারের সনদপত্র।[৮] আলী মুহাম্মদ জুমআহ (জ. ১৯৫১ খ্রি.) সুকূকের শাব্দিক অর্থে বলেন, "এমন লিখিত সনদ যাতে বিভিন্ন লেনদেন, স্বীকৃতি, মামলার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে।"[৯] কুতুব মুস্তাফা (জ. ১৯৬৬ খ্রি.) বলেন, "এমন সনদ যা কোন

---

৬. ইমাম নববী, *সহীহ মুসলিম বিশারহিন নববী*, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭ হি/ ১৯৮৭ইং, খ. ২, পৃ. ১৭১

الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام

৭. ইমাম মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুয়াত্তা* (রিওয়ায়াতে ইয়াহয়া লাইসী), বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : আল-ইনা ওয়া মা ইয়াশবাহুহা, মিসর : দারু ইয়াহয়াউত তুরাস আল-আরাবী, খ. ২, পৃ. ৬৪১, হাদীস নং-১৩১৪

৮. আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর ফী গারীবিশ শারহিল কাবীর লিররাফি'য়ী*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩৪৫; ইবনে মানযূর, *লিসানুল আরব*, খ. ১০, পৃ. ৪৫৬

৯. আলী মুহাম্মদ জুমআহ, *মুজামু আল-মুসতালাহাত আল-ইকতিসাদিয়াহ ওয়াল ইসলামিয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ২০০০ইং, পৃ. ৩৫৬

هو عبارة من الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير ووقائع الدعوى

অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে।"[১০] অন্যদিকে সাকাঈক (صكائك) দ্বারা কেউ কেউ মুদ্রা (Minting coins) বুঝিয়েছেন। আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত আরবী এ শব্দটি পরবর্তীতে আফ্রিকা ও ইউরোপেও প্রসিদ্ধ হয় এবং এ থেকে চেক (Cheque) শব্দের প্রচলন হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান।[১১]

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ

আধুনিক প্রেক্ষাপটে সুকূক শব্দটি অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি বিশেষ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর সংজ্ঞা নির্ধারণে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। নিম্নে সুকূকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা আলোচনা করা হল :

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) অধিভুক্ত ইসলামী ফিক্হ বোর্ড (মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী) এর চতুর্থ বৈঠকে সুকূকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে :

أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساوية، وذلك بإصدار صكوك مالية برأس المال على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس المال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه.

"এমন এক বিনিয়োগ দলিল, যা মূলধনকে সমমূল্যের বিভিন্ন এককে পরিণত করে আর্থিক পরিপত্র ইস্যুর মাধ্যমে মূলধনকে সমানভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এবং যা এর ধারকগণের নামেই নিবন্ধিত করা হয় এ বিবেচনায় যে, তারা মূলধন ও মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে যা মূলধনের প্রতি প্রবর্তিত হয় তার নির্দিষ্ট অংশের মালিকানা বহন করেন।"[১২]

মালয়েশিয়া ভিত্তিক ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বোর্ড সুকূকের সংজ্ঞা দিয়েছে:
"Certificate that represents the holder's proportionate ownership in an undivided part of an underlying asset where the holder assumes all rights and obligations to such asset."

---

১০. কুতুব মুস্তাফা শানু, "সুকূকুল ইজারা", *মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিক্হিল ইসলামী*, মক্কা আল-মুকাররামাহ, সংখ্যা ১৫, খ. ২, ২০০৪খ্রি., পৃ. ৬৩

الوثيقة التي تتضمن إثباتا لحق من الحقوق أو السند الذي يمثل حق من الحقوق

১১. Nathif J. Adam and Abdulkader Thomas, *Islamic Bonds : Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk,* London : Euromoney Books, 2004, p 42-43.

১২. *মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী*, জিদ্দা : ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), ইস্যু-৪, খ. ৩, ১৯৮৮খ্রি. পৃ. ২১৪০

"এমন সনদ যা তার বাহকের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পদের অবিভক্ত কোন অংশের সম্পৃক্ত মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে যদি বাহক উক্ত সম্পদের যাবতীয় অধিকার ও দায়িত্ব পরিগ্রহ করেন।"[১৩]

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণকারী সংস্থা (AAOIFI) এর শরীআহ স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয়েছে :

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص.

"সুকূক সমমূল্যের এমন সব সনদ, যা কোন বিদ্যমান নির্দিষ্ট সম্পত্তি (Tangible Assets) অথবা সম্পদের উপস্বত্ব (Usufruct) অথবা সেবা (Services) অথবা নির্দিষ্ট কোন প্রকল্প বা বিশেষ বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধিভুক্ত সম্পত্তির অভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।"[১৪]

মালয়েশিয়া সিকিউরিটিজ কমিশনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

"Any securities issued pursuant to any shariah principles and concepts approved by the shariah council of the securities commission as a document or certificate which represents the value of an asset".

"এমন এক আর্থিক সনদ, যা কোন সম্পদের মূল্যমানের প্রতিনিধিত্বকারী দলিল বা সনদ হিসেবে শরীয়াহ নীতিমালা বা শরীয়াহসম্মত ধারণার আলোকে প্রস্তুতকৃত ও সিকিউরিটিজ কমিশনের অধিভুক্ত শরীয়াহ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত।"[১৫]

অতএব বলা যায়, সুকূক মূলত নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তির মূল্যের প্রতিনিধিত্বকারী দলিল, যা শরীয়তের কোন নীতির আলোকে লেনদেনের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং শরয়ী পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়।

সুকূকের বৈশিষ্ট্য

সুকূকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

ক. **ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সম্পদে মালিকানা সাব্যস্তকারী** : সুকূক এর বাহককে ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সম্পদে মালিকানা সাব্যস্ত করে। সে

---

১৩. *Capital Adequacy Standard for institutions offering only Islamic financial services (IIFS)*, Kuala Lumpur : Islamic Financial Services Board, 2005, Standard No. 2, p. 47

১৪. *আল-মায়াঈর আশ্-শারয়ীয়্যাহ (শরীয়াহ মানদণ্ড)*, বাহরাইন : ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণ সংস্থা (AAOIFI), ২০০৭, মানদণ্ড নং-১৭, পৃ. ২৮৮

১৫. Securities Commission Malaysia, *The Islamic Securities (Sukuk) Market*, Petaling Jaya : LexisNexis, 2009. p. 9.

হিসেবে সুকূক মূলত সংশ্লিষ্ট সম্পদে বাহকের অংশীদারিত্বের স্বীকৃতিসনদ। অতএব এটি বন্ডের মত ঋণপত্র নয়। এ মালিকানা সংশ্লিষ্ট সম্পদ, মুনাফা ও ঋণ সব কিছুতেই সাব্যস্ত। মালিকানার দিক থেকে সুকূকধারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডারের মত লাভ-ক্ষতি ও ঝুঁকি বহন করে। সম্পদ ছাড়া সম্পদের উপস্বত্ব বা সেবার বিপরীতেও সুকূক ইস্যু করা যেতে পারে।

খ. **মুনাফা প্রদানকারী ইসলামী বিনিয়োগপত্র :** সুকূক তার বাহককে মুনাফায় অংশ প্রদান করে। তবে মুনাফার পরিমাণ পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট থাকে না। কিন্তু প্রকল্পের লভ্যাংশ থেকে সুকূকধারীর প্রাপ্য শতকরা হার উভয় পক্ষের চুক্তির সময় অর্থাৎ সুকূক ইস্যুর বিজ্ঞপ্তিতে অথবা সুকূকের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। যদি কোন বিনিয়োগ সনদ তার বাহককে নির্দিষ্ট মুনাফা (Fixed benefit) প্রদান করে, অথবা তার (Face Value) এর কিছু অংশের বিপরীতে মুনাফা প্রদান করে, অথবা বিজ্ঞপ্তি বা সনদে বাহকের জন্য মুনাফার হার নির্ধারণ না করে, অথবা প্রকল্প শেষে বা অন্তর্বর্তী মুনাফা বন্টনের সময় অনির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করে তবে তা ইসলামী বিনিয়োগপত্র হতে পারে না। কেননা ইসলামী বিনিয়োগপত্র হওয়ার মৌলিক শর্তের মধ্যে লভ্যাংশে অর্থযোগানদাতা (রাব্বুল মাল) হিসেবে সুকূকধারক ও প্রকল্প পরিচালক (মুদারিব) হিসেবে ইস্যুকারীর শতকরা হার অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

গ. **স্বত্বাধিকারীকে এর ঝুঁকি বহনে বাধ্যকারী :** সুকূক এর ধারককে এ সংক্রান্ত যাবতীয় ঝুঁকি বহন করতে বাধ্য করে। ফলে সংশ্লিষ্ট সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি বা মেয়াদান্তে কোন প্রকার লোকসান হলে তার ভার বহন করতে হয়।

ঘ. সুকূক অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনিময়যোগ্য আর্থিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঙ. সুকূক ইস্যুকরণ প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে শরীয়াহ পরিপালন করা হয়।

চ. শরয়ী কোন চুক্তির বিপরীতে সুকূক ইস্যু করা হয়।

ছ. সুকূক লেনদেনের ক্ষেত্রেও যথাযথভাবে শরীয়াহ পরিপালন করতে হয়।

সুকূক, কনভেনশনাল বন্ড ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য

কেউ কেউ মনে করেন, সুকূক কনভেনশনাল বন্ডের ইসলামী বিকল্প, ফলে তারা একে ইসলামী বন্ড হিসেবে পরিচয় দেন। প্রকৃতপক্ষে সুকূকের সর্বোত্তম পরিচয় হচ্ছে, এটি ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট বা ইসলামী বিনিয়োগ পত্র। সুকূকের এ পরিচয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা একে কনভেনশনাল ফিক্সড রেট বিলস (নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় সুদভিত্তিক অর্থপত্র) বা বন্ড বা ফ্লোটিং রেট নোটস (অস্থায়ী হারে প্রদেয় সুদভিত্তিক অর্থপত্র) কোনটির সাথেই তুলনা করা যায় না। বরং একে শরীয়াহসম্মত পদ্ধতিতে সম্পদ এবং তহবিল বৃদ্ধির একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা যায়। ইতোমধ্যে সুকূক তথা ইসলামিক ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিস বিশেষ প্রকারের এক এসেট

হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। কনভেনশনাল বন্ড সাধারণ বিনিয়োগকারীদের নিকট যেমন গুরুত্বপূর্ণ এ এসেট মুসলিম বিনিয়োগকারীদের নিকট তেমনই আকর্ষণীয়। তদুপরি ইসলামিক ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিস অমুসলিম তথা কনভেনশনাল লেনদেনে অভ্যস্তদের জন্যও প্রয়োজনীয়, কারণ এর মাধ্যমে তাদের বিনিয়োগে (Investment Portfolio) বৈচিত্র্য আসে, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার (Risk Management) জন্য খুবই সহায়ক।[১৬]

কনভেনশনাল বন্ড সাধারণত সুদভিত্তিক। মেয়াদোত্তীর্ণ হলে অথবা নির্ধারিত সময় পর পর এর বিনিয়োগকারীকে লাভ হিসেবে সুদ দেয়া হয়, যা ইসলামী আইনে সম্পূর্ণ হারাম। এ সব বন্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত ফান্ড কোন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হয় তার প্রতি বন্ড ক্রেতাদের খুব কমই আগ্রহ থাকে। হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ নির্বিশেষে সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে এ ফান্ড বিনিয়োগ করা হয়, যা মুসলিম বিনিয়োগকারীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়া যে সব কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে ব্যাংক ঋণে আবদ্ধ (Highly leveraged with bank debt) কখনো কখনো তারা পুনঃঅর্থায়ন (Re-financing)-এর জন্য বন্ড ইস্যু করে থাকে, যা শরীয়া'র দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিয়োগের উপযোগী খাত হিসেবে বিবেচিত নয়।

সাধারণত বন্ড ক্রেতাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলধন বৃদ্ধি। যেহেতু কনভেনশনাল বন্ডে সুদের হার নির্ধারিত থাকে, তাই সুদের বাজার দরের উপর বন্ডের বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে। কনভেনশনাল বন্ডে মূলত একটি কাগজের টুকরোর উপর লেনদেন হয়; বাস্তবিক ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা সংশ্লিষ্ট সম্পদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া বন্ডের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, অর্থ পরিশোধের অক্ষমতা (Payment default) যা সাধারণত রেটিং এজেন্সীর মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়। সুতরাং বন্ড হচ্ছে শুধুমাত্র কাগজের একটি টুকরোর উপর সম্পন্ন হওয়া লেনদেন, যা তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকির পরিমাণ অনুমানের (Risk Estimation) উপর নির্ভর করে এবং যেখানে বিনিয়োগকারীকে শুধুমাত্র রিস্ক-রিটার্ন হিসাব করলেই চলে, বাস্তবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।[১৭]

সুকূক তথা ইসলামী বিনিয়োগপত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে লভ্যাংশের পূর্বনির্ধারিত কোন হার নির্দিষ্ট করার কোন সুযোগ নেই, যদিও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভাব্য একটি হার ধার্য্য করে দেয়া হয়; কিন্তু সময়ে সময়ে তা উঠানামা করে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি আন্ডারলায়িং এসেট কিংবা এ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা-

---

১৬. Rodney Wilson, *Overview of the sukuk market* in *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk* by Nathif J. Adam and Abdulkader Thomas, p. 3.

১৭. Wilson, *Overview of the sukuk market*, ibid. p. 5.

বাণিজ্যের লাভ-ক্ষতির উপর নির্ভর করে, শুধুমাত্র এক টুকরো কাগজের উপর লেনদেন করে এখানে ইতিটানা যায় না। তাইতো শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞগণ, বিশেষ করে মুফতী তাকী উসমানী (জ. ১৯৪৩ খ্রি.) খুব জোর দিয়ে বলেছেন : ইসলামিক ফাইন্যান্সের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি সত্যিকারের উৎপাদন, বাস্তবিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রকৃত পরিসম্পদ সৃষ্টি ইত্যাদিতে ফান্ড যোগান দেয়ার সাথে জড়িত।[১৮]

মৌলিকভাবে বিনিয়োগপত্রগুলো দু'ধরনের হয়ে থাকে : মালিকানাপত্র (Ownership instrument) ও ঋণপত্র (Debt instrument)। কনভেনশনাল বন্ড মূলত ঋণপত্র যা "আমি তোমার কাছে দায়বদ্ধ" (IOU) মূলনীতির উপর ইস্যু করা হয় এবং যেখানে নির্ধারিত বা অস্থায়ী সুদের হার জানিয়ে দেয়া হয়। অপরদিকে সুকূক মালিকানাপত্র যা মূলত সংশ্লিষ্ট বা আন্ডারলায়িং এসেট, সার্ভিস কিংবা প্রকল্প সমমান মূল্যের অভিন্ন আইনগত ও সুবিধাভোগী মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে।

উল্লেখ্য যে, সুকূক যদিও মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে, তথাপি তা কোম্পানির শেয়ার থেকে ভিন্ন। সুকূক এমন অর্থপত্র যার ঝুঁকি অনেক কম, পক্ষান্তরে শেয়ারের ঝুঁকি অনেক বেশি। ইস্যুকারীর বিবেচনায় সুকূক সাধারণত ব্যালেন্সশীট বহির্ভূত বিনিয়োগপত্র, পক্ষান্তরে কোম্পানির মূলধনের অংশ। নিম্নের সারণীতে সুকূক, বন্ড ও শেয়ারের পার্থক্য দেখানো হয়েছে :

পার্থক্যের দৃষ্টিকোণ	সুকূক	বন্ড	শেয়ার
সূচনাসাল	১৯৯০	১৬০০	১৬০০
প্রকৃতি	ইস্যুকারীর জন্য ঋণ নয়; বরং সংশ্লিষ্ট বা আন্ডারলায়িং এসেট, প্রকল্প কিংবা সেবার অবিভক্ত এবং সুকূকের উপর লিখিত সমমান মূল্যের মালিকানা	ইস্যুকারীর ঋণ	কোম্পানির ব্যবসায় মালিকানায় অংশ
সংশ্লিষ্ট সম্পদ (এসেট রেকর্ড)	ইস্যু করার জন্য কমপক্ষে ৫১% স্পর্শ্যমান ও নির্দিষ্ট সম্পদ প্রয়োজন	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
দাবি	সংশ্লিষ্ট সম্পদ/ প্রকল্প/ সেবা ইত্যাদিতে মালিকানা দাবি	ঋণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/ কোম্পানীতে ঋণদাতার ঋণের দাবি	কোম্পানিতে মালিকানা দাবি
নিরাপত্তা	আন্ডারলায়িং এসেটে মালিকানার মাধ্যমে সুকূক সংরক্ষিত এবং নিরাপদ। উপরন্তু এত গ্যারান্টি, সহযোগী জামানত (Collateral) ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি (Credit enhancement) ইত্যাদি বিদ্যমান	সাধারণত অরক্ষিত ও জামানতবিহীন ঋণপত্র (Unsecured Debenture)	অরক্ষিত ও অনিরাপদ

---

১৮. Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, The Hague : Kluwer Law International, 2002, pp. 14-17.

পার্থক্যের দৃষ্টিকোণ	সুকুক	বন্ড	শেয়ার
মূলধন ও লাভ	ইস্যুকারীর পক্ষ থেকে কোন গ্যারান্টি নেই	ইস্যুকারী কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদত্ত	কোম্পানী থেকে কোন গ্যারন্টি নেই
উদ্দেশ্য	অবশ্যই শরীআহসম্মত ও বৈধ হতে হবে	যে কোন উদ্দেশ্যে হতে পারে	যে কোন উদ্দেশ্যে হতে পারে
লেনদেন	সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ, প্রকল্প কিংবা সেবায় মালিকানার অধিকার ও তদসংক্রান্ত লাভ ইত্যাদির উপর লেনদেন হয়	ঋণপত্র লেনদেন	কোম্পানির মূলধনের অংশ বিশেষের লেনদেন
বিনিয়োগকারী তথা সুকুকধারীর দায়িত্ব	সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ, প্রকল্প কিংবা সেবার প্রতি সুকুকধারীর নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং তা সুকুক সার্টিফিকেটের মূল্যমান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ	ইস্যুকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অবস্থার প্রতি বন্ড ধারকের কোন দায়-দায়িত্ব নেই	কোম্পানীর কর্মতৎপরতার প্রতি শেয়ার হোল্ডারের দায়-দায়িত্ব রয়েছে তবে তা সাবস্ক্রিপশন লেভেল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ

সারণী ০১ : সুকুক, বন্ড ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য[১৯]

সুকুকের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুকুককে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

ক. সম্পদের দৃষ্টিকোণ

যে সম্পদকে কেন্দ্র করে সুকুক ইস্যু করা হয় উক্ত সম্পদের ভিত্তিতে একে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. সম্পদভিত্তিক সুকুক (Asset based Sukuk)

২. সম্পদ সমর্থিত সুকুক (Asset backed Sukuk)

যে সম্পদকে কেন্দ্র করে সুকুক ইস্যু করা হয়েছে মূল ইস্যুকারী যদি ইস্যুর জন্য গঠিত বিশেষ কর্তৃপক্ষ তথা স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) বরাবর মালিকানা হস্তান্তরপূর্বক উক্ত সম্পদ বিক্রি না করে বরং একটি মূল্য ধরে তার বিপরীতে সুকুক ইস্যু করে, তবে তাকে সম্পদভিত্তিক সুকুক বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি মূল ইস্যুকারী উক্ত সম্পদ বিশেষ কর্তৃপক্ষের কাছে মালিকানা হস্তান্তরপূর্বক বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে বিক্রয় করে দেয়, তবে তাকে সম্পদ সমর্থিত সুকুক বলা হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদভিত্তিক সুকুক ও সম্পদ সমর্থিত সুকুকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি চিত্র উপস্থাপন করা হলো :

---

১৯. Adam and Thomas, *Islamic Bonds : Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk*, p 54; Mohd Azmi Omar, Muhamad Abduh & Raditya Sukmana, *Fundamentals of Islamic Money and Capital Markets*, Singapore : John Wiley & Sons, 2013, p. 80.

পার্থক্যের দৃষ্টিকোণ	সম্পদভিত্তিক সুকূক	সম্পদ সমর্থিত সুকূক
বৈশিষ্ট্য	সুকূক ইস্যুর সুবিধার্থে শরীয়াহ অনুমোদিত কোন সম্পদ বা ব্যবসায়িক উদ্যোগকে কাজে লাগায়।	সম্পদ সমর্থিত শরীয়াহ অনুমোদিত কোন সম্পদ বা ব্যবসায়িক উদ্যোগকে কাজে লাগায় যা বিনিয়োগকারীর আয়/ লাভের প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাজ করে।
হিসাবরক্ষণের মূল ধারণা	ব্যালেন্সশীটের অভ্যন্তরে (ইস্যুকারী ও দায় বহনকারী উভয়ের জন্য)	ব্যালেন্সশীটের বাইরে (ইস্যুকারীর জন্য)। বাস্তবিক বিক্রয়ের মানদণ্ডঃ আইনগত এবং হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সশীটে অবস্থান থাকবে না।
অর্থায়ন ব্যয়	বাজার প্রচলিত দরে, মূলতঃ ইস্যুকারীর ঋণের মূল্যায়ন ও স্থিতির উপর নির্ভর করে।	মূলত সম্পদের অর্থ প্রবাহ (Cash flow) ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।
মান নির্ধারণ (Rating)	ইস্যুকারী বা দায় বহনকারীর কোম্পানির নির্ধারিত মান অনুযায়ী।	অর্থ প্রবাহের ক্ষমতার ভিত্তিতে।

সারণী ০২ : সম্পদভিত্তিক সুকূক ও সম্পদ সমর্থিত সুকূকের মধ্যে পার্থক্য[২০]

খ. শরয়ী চুক্তির দৃষ্টিকোণ

ইসলামী শরীয়াহর যে চুক্তির উপর ভিত্তি করে সুকূক ইস্যু করা হয় সে দৃষ্টিকোণ থেকে সুকূক বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত।

১. বিক্রয়ভিত্তিক (Sales-based) চুক্তি। যেমন- বাই বিস সামান আজিল (বিবিএ), মুরাবাহা, সালাম, ইসতিসনা'।

২. ভাড়াভিত্তিক (Lease-based) চুক্তি। যেমন- ইজারা, ইজারাহ মুতানাহিয়া বিত-তামলিক, ইজারাহ মাওসূফাহ বিয যিম্মাহ।

৩. অংশীদারিত্বমূলক (Partnership-based) চুক্তি। যেমন- মুদারাবা ও মুশারাকা।

৪. প্রতিনিধিত্বমূলক (Agency-based) চুক্তি। যেমন- ওয়াকালাহ বিল ইসতিছমার।

গ. বাণিজ্যিক কার্যকলাপ (commercial function) এর দৃষ্টিকোণ

সুকূকের বাণিজ্যিক কার্যকারিতা বিবেচনায় একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

১. কর্পোরেট (Corporate) সুকূক : বেসরকারি ফার্ম তথা বিভিন্ন কোম্পানির পক্ষ থেকে ইস্যু করা হয়।

---

২০. Omar, Abduh & Sukmana, *Fundamentals of Islamic Money and Capital Markets*, ibid, p. 81.

২. সার্বভৌম (sovereign) সুকূক : সরকার অথবা সার্বভৌম/ স্বায়ত্তশাসিত কোন সংস্থা থেকে ইস্যু করা হয়।

৩. পরিবর্তন ও বিনিময়যোগ্য (Exchangeable and convertible): যা মেয়াদান্তে মূলধন/ শেয়ারে রূপান্তর সম্ভব হয়।

৪. অধীনস্ত (Subordinate): সুকূকের প্রত্যর্পণ ঋণদাতা বা বিনিয়োগকারীর অধীনস্ত হয়।

৫. যুক্ত (stapled) সুকূক: দুটি দলিল একত্রে এমনভাবে আটকানো থাকে যে, তা বিচ্ছিন্ন করে বিনিময় করা সম্ভব নয়।[২১]

নিম্নের চিত্রে সুকূকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকারগুলো উল্লেখ করা হয়েছে:
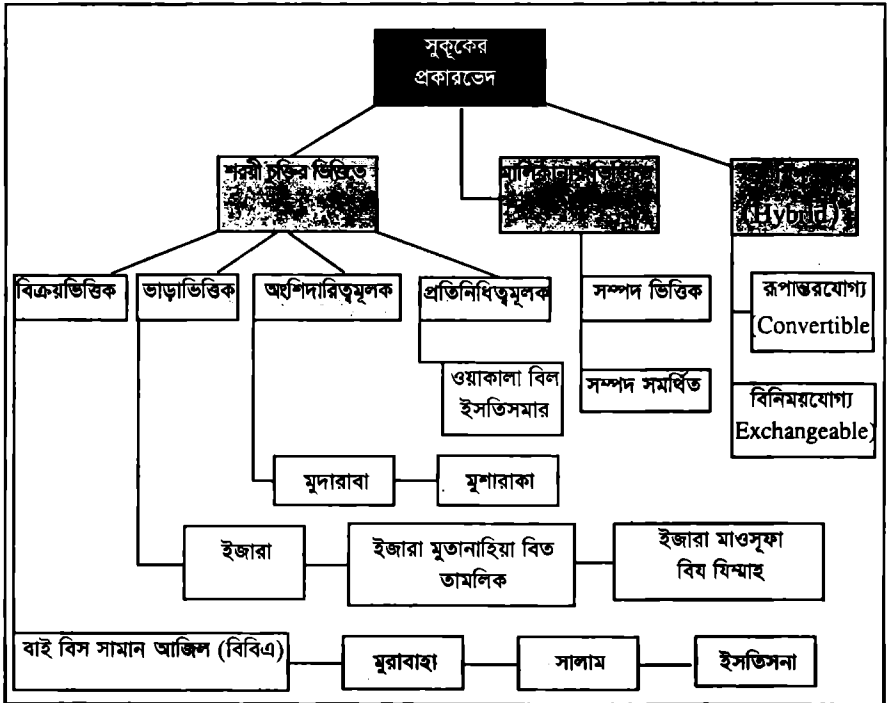
চিত্র ০১ : সুকূকের প্রকারভেদ[২২]

---

[২১] Dusuki (edited), *Islamic Financial System Principles & Operations*, ibid, p. 400.
[২২] Securities Commission Malaysia, *The Islamic Securities (Sukuk) Market*, ibid, p. 48.

চিত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক. **ওয়াকালা বিল ইসতিছমার (وكالة بالاستثمار) বিনিয়োগে প্রতিনিধিত্ব প্রদান :** কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজ সম্পদে প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অথবা বিনা পারিশ্রমিকে অন্যকে কর্তৃত্বের ক্ষমতা অর্পণ করাকে ওয়াকালা বিল ইসতিছমার বলা হয়। (দ্র. শরীয়াহ মানদণ্ড নং ৪৬, ধারা-২)

খ. **মুদারাবা (مضاربة) :** মুনাফায় এমন অংশীদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (রাব্বুল মাল বা পুঁজিপতি) মূলধন যোগান দেয় এবং অন্যপক্ষ (মুদারিব বা উদ্যোক্তা) শ্রম দেয়। (দ্র. শরীয়াহ মানদণ্ড নং ১৩, ধারা-২)

গ. **মুশারাকা (مشاركة) :** মুশারাকা শব্দের অর্থ অংশিদারিত্ব। পরিভাষায় মুশারাকা বলা হয় এমন যৌথ কারবারকে যার মূলধন একাধিক পক্ষ সরবরাহ করে এবং ঐকমত্য হওয়া চুক্তি অনুযায়ী পক্ষসমূহের মধ্যে লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হয়। (দ্র. Zaharuddin, *Contracts & the Products of Islamic Banking*, Kuala Lumpur : CERT publications, 2nd Edition, 2012, p. 300).

ঘ. **ইজারা (إجارة) :** ইজারা অর্থ ভাড়া, পরিভাষায় নির্দিষ্ট মূল্যে কোন সেবা বা উপযোগিতা বা সুযোগকে বিক্রি করা। এ চুক্তির আলোকে ব্যাংক গ্রাহককে কোন সেবা, সম্পদ বা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে এবং গ্রাহক নির্দিষ্ট বিনিময়ে তা ভোগ করেন। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮)

ঙ. **ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক (إجارة منتهية بالتمليك) :** এ পদ্ধতিকে ইজারা ছুম্মা বাই (إجارة ثم بيع), ইজারাহ বিল বাই (إجارة بالبيع), ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক (إجارة بالبيع تحت شركة الملك), ইজারা ওয়া ইকতিনা' (إجارة واقتناع) ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী, কোন স্থায়ী বা হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ ক্রয়পূর্বক গ্রাহককে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য ক্রমহ্রাসমান হারে কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে ভাড়া দেয়া হয়। চুক্তির মেয়াদ শেষে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ হওয়ায় উক্ত সম্পদের মালিকানা গ্রাহক লাভ করেন। (দ্র. Nik Norzrul Thani et al., *An Introduction to Islamic and Conventional Corporate Finance*, Petaling Jaya (Malaysia) : Thomson Reuters Malaysia, 2012, p. 78)

চ. **ইজারা মাওসূফাহ ফীয যিম্মাহ (إجارة موصوفة في الذمة) :** ইজারা মাওসূফাহ ফীয যিম্মাহ মূলত ইজারা ও সালাম এ দুই চুক্তির আলোকে গঠিত একটি স্বতন্ত্র চুক্তি। পরিভাষায় কোন সম্পদের ভাড়াচুক্তি সম্পাদনের সময় যদি উক্ত সম্পদ বর্তমান না থাকে তখন বাই সালামের মত উক্ত সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদানপূর্বক ভাড়াচুক্তি সম্পন্ন করাকে ইজারা মাওসূফাহ ফীয যিম্মাহ বলে। (দ্র. Zaharuddin, *Contracts & the Products of Islamic Banking*, ibid, p. 298).

ছ. **বাই' বি-ছামান আজিল (بيع بثمن آجل) :** একে বাই' মুয়াজ্জাল (بيع مؤجل), বাই' ইলা আজাল (بيع إلى أجل), বাই' আন নাসিয়া (بيع النسيئة)ও বলা হয়। এককথায় বাকি মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করাকে বাই' বি-ছামান আজিল বলা হয়। (দ্র. Thani et al., *An Introduction to Islamic and Conventional Corporate Finance*, ibid, p. 65).

জ. **মুরাবাহা (مرابحة) :** মুরাবাহা বলা হয় বিক্রেতা কর্তৃক ক্রয়কৃত মূল্যের উপর একমত হওয়া নির্ধারিত বাড়তি যোগ করে পণ্য বিক্রয় করাকে। এ লভ্যাংশ বিক্রয় মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে, আবার 'থোক'ও হতে পারে। (দ্র. শরীয়াহ মানদণ্ড নং ৮, পরিশিষ্ট ঘ)

ঝ. **বাই সালাম (بيع سلم) :** বাই সালাম বলা হয়, অগ্রিম মূল্য ও বাকি পণ্যের লেনদেনকে। অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে স্পষ্টভাবে বর্ণনাকৃত পণ্য সরবরাহের শর্তে বেচাকেনা করা। (দ্র. শরীয়াহ মানদণ্ড নং ১০, পরিশিষ্ট গ)

ঞ. **ইসতিসনা' (استصناع) :** ক্রেতার চাহিদানুযায়ী স্পষ্টভাবে বর্ণনাকৃত বস্তু সরবরাহ করার চুক্তিকে ইসতিসনা' চুক্তি বলা হয়। (দ্র. শরীয়াহ মানদণ্ড নং ১১, পরিশিষ্ট গ)

সুকূক ইস্যুকরণ প্রক্রিয়া

ইসলামী সিকিউরিটাইজেশন তথা সুকূক ইস্যুকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনার পূর্বে এ সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরী বিষয় আলোচনা করা হলো:

ইসলামিক সিকিউরিটাইজেশন

সিকিউরিটাইজেশন (Securitization) বলতে মূলত এমন প্রক্রিয়া বুঝানো হয়, যার মাধ্যমে কোন সম্পদ বাজারে লেনদেনযোগ্য সম্পদে রূপান্তর করা হয়। ইসলামিক সিকিউরিটাইজেশন প্রক্রিয়া মূলত যে সংশ্লিষ্ট সম্পদের উপর ভিত্তি করে সুকূক ইস্যু করা হয় তার সত্যিকার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যা সম্পদের মালিক তথা সুকূক ইস্যুকারী পক্ষ সুকূক ইস্যুকরণের জন্য গঠিত বিশেষ কর্তৃপক্ষের (Special Purpose Vehicle/SPV) কাছে বিক্রয় করে থাকে। এ কারণে ইসলামী সিকিউরিটাইজেশনের এ প্রক্রিয়াকে সম্পদ সমর্থিত সিকিউরিটাইজেশন (Asset-Backed Securitization/ABS) নামেও আখ্যা দেয়া হয়। কেননা বিশেষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে বিনিয়োগপত্র ইস্যু করা হয় তা মূলত তার নিকট বিক্রিত সম্পদের বিপরীতে ইস্যু করা হয়।

ইসলামিক ফাইনান্সে সিকিউরিটাইজেশন প্রক্রিয়া দু'টি ধাপে বিকাশ লাভ করে :

প্রথমত ইসলামিক বন্ড বা ইসলামিক প্রাইভেট ডেব্ট (debt) সিকিউরিটাইজেশন; যা সাধারণত সংশ্লিষ্ট সম্পদের সত্যিকার বিক্রয় চুক্তি ছাড়াই সম্পন্ন করা হয়। এ প্রকার সিকিউরিটাইজেশন সাধারণত "ইসলামিক এসেট-সিকিউরিটাইজেশন" অথবা "সিকিউরিটাইজেশন ডেব্ট সিকিউরিটাইজেশন" নামে পরিচিত। ইসলামিক প্রাইভেট ডেব্ট সিকিউরিটাইজেশন (IPDS) ইস্যুকরণের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন স্পেশাল কর্তৃপক্ষ ছাড়াই ইস্যুকারী পক্ষ সরাসরি বিনিয়োগকারীদের নিকট ইস্যু করে থাকে।

দ্বিতীয়ত একটি বাস্তবসম্মত বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে সুকূক তথা এসেট বেকড সিকিউরিটাইজেশন ইস্যু করা হয়। উদারহণস্বরূপ মালয়েশিয়া গ্লোবাল সুকূক ইজারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সুকূক এসেট বেকড সিকিউরিটাইজেশন মডেল তথা সত্যিকার বিক্রয় চুক্তির উপর ভিত্তি করেই ইস্যু করা হয়েছে।

সম্পদ সমর্থিত ইসলামী সিকিউরিটাইজেশন মডেল

সম্পদ সমর্থিত ইসলামী সিকিউরিটাইজেশন (Asset backed Islamic securitization) এর মডেল নিম্নরূপ :
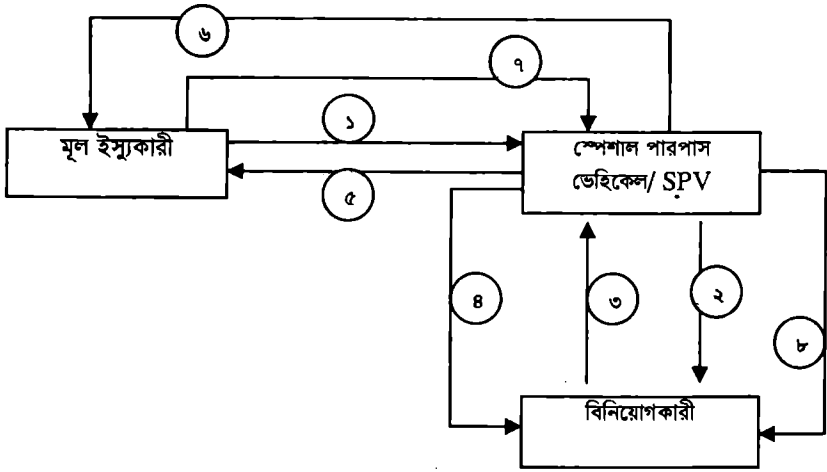
চিত্র ০২ : সম্পদ সমর্থিত ইসলামী সিকিউরিটাইজেশন মডেল[২৩]

১. যে সম্পদের বিপরীতে সুকূক ইস্যু করা হবে অরিজিনেটর তথা মূল ইস্যুকারী উক্ত সম্পদ সুকূক ইস্যু করার লক্ষ্যে গঠিত স্পেশাল কর্তৃপক্ষের (SPV) কাছে বিক্রি করবে।
২. স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) বিক্রিত সম্পদের উপর ভিত্তি করে সুকূক ইস্যু করত বিনিয়োগকারীদের নিকট তা বিক্রি করবে।
৩. বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগপত্র তথা সুকূকের মূল্য পরিশোধ করবে।
৪. সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা থেকে বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ বন্টন করা হবে।
৫. সুকূক বিক্রিত মূল্য থেকে অরিজিনেটরকে এসেটের মূল্য পরিশোধ করা হবে।
৬. সুকূক মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) অরিজিনেটরের নিকট সংশ্লিষ্ট এসেটটি পূর্ব ক্রয়মূল্যের সমপরিমাণ মূল্যে পুনর্বিক্রি করবে।
৭. অরিজিনেটর এসেটটির মূল্য বাবদ নগদ অর্থ পরিশোধ করবে।
৮. স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) বিনিয়োগকারীদের সুকূক তথা বিনিয়োগপত্রের মূল্য পরিশোধ করত সুকূকের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

উপর্যুক্ত ডায়াগ্রামটিতে (১) এবং (৫) চিহ্নিত রেখা দুটি অরিজিনেটর এবং স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) এর মধ্যকার সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট এসেটের সত্যিকার বিক্রয় চুক্তির প্রতিই দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। উল্লেখ্য, সুকূকের শরীয়া বিধিবদ্ধতা উক্ত দু'পক্ষের মধ্যকার সত্যিকার বিক্রয় চুক্তির উপর নির্ভরশীল। অরিজিনেটর তথা সুকূক ইস্যুকারী পক্ষ যে এসেটের উপর ভিত্তি করে সুকূক ইস্যু করবে সর্বপ্রথম তা অবশ্যই স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল তথা সুকূক ইস্যু করার জন্য গঠিত বিশেষ পক্ষের কাছে

---

[২৩] Saiful Azhar Rosly, *Islamic Capital Market*, Kuala Lumpur : International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), 2011, pp. 91-94.

মালিকানা হস্তান্তর পূর্বক সত্যিকারার্থে বিক্রি করতে হবে। কারণ সুকূক বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতি সংশ্লিষ্ট এসেট থেকে অর্জিত লাভ-ক্ষতির উপর নির্ভর করবে। উক্ত দু পক্ষের মধ্যে সত্যিকার বিক্রয় চুক্তি ব্যতীত সুকূকে বিনিয়োগ ইসলামী আইন মোতাবেক বৈধ হবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে তা কনভেনশনাল বিনিয়োগপত্রের ন্যায় কোন সম্পদের সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই শুধুমাত্র এক টুকরো কাগজের উপর লেনদেন পূর্বক পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ বন্টনের সমতুল্য হবে, যা ইসলামী আইনে বৈধ নয়।

প্রসঙ্গক্রমে সম্পদ সমর্থিত কনভেনশনাল ডেব্ট সিকিউরিটিস ও সম্পদ সমর্থিত ইসলামী ডেব্ট সিকিউরিটিসের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা প্রয়োজন। উভয় সিকিউরিটিসের এক্ষেত্রে একই ধরনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হলেও উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে।
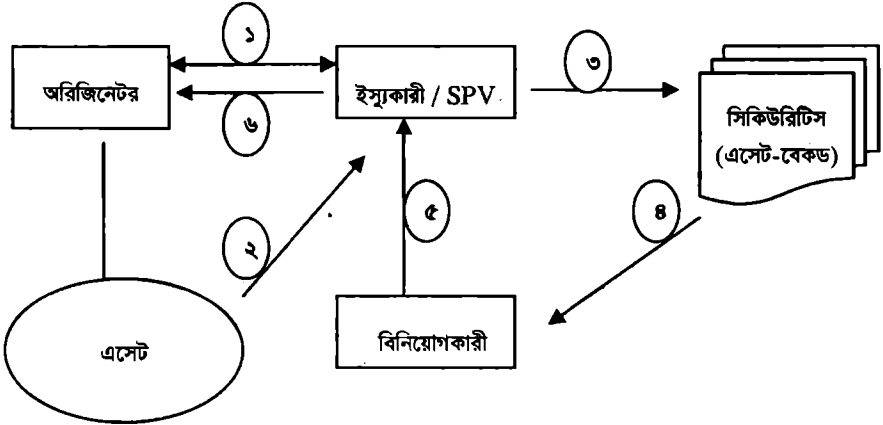
চিত্র ০৩ : সম্পদ সমর্থিত সিকিউরিটাইজেশন কাঠামো[২৪]

সম্পদ সমর্থিত কনভেনশনাল ডেব্ট সিকিউরিটিস

১. অরিজিনেটর ও ইস্যু করার দায়িত্ব দিয়ে গঠিত এসপিভির মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্পদের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে।
২. উক্ত চুক্তি অনুযায়ী অরিজিনেটর সংশ্লিষ্ট সম্পদ তথা উসূলযোগ্য ঋণের (Receivables) এসপিভির নিকট হস্তান্তর করবে।
৩. এসপিভি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সিকিউরিটাইজ করে বিনিয়োগপত্র ইস্যু করবে যা সম্পদ সমর্থিত সিকিউরিটিস নামে পরিচিত।
৪. এ ধাপে এসপিভি সিকিউরিটিসগুলো আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করবে।

[২৪] Ibid, p. 189

৫. বিনিয়োগকারীগণ সিকিউরিটিসের বুক ভ্যালু বা লিখিত মূল্য পরিশোধ করবে।
৬. বিনিয়োগকারীদের থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে এসপিভি অরিজিনেটরকে সংশ্লিষ্ট এসেটের ক্রয়মূল্য পরিশোধ করবে।[২৫]

সম্পদ সমর্থিত ইসলামিক ডেব্‌ট সিকিউরিটিস

১. অরিজিনেটর ও ইস্যুকরার দায়িত্ব দিয়ে গঠিত এসপিভি এ দু'য়ের মাঝে সংশ্লিষ্ট এসেটের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে।
২. উক্ত চুক্তি অনুযায়ী অরিজিনেটর সংশ্লিষ্ট সম্পদ তথা শুধুমাত্র শরীরী অথবা আর্থিক ও শরীরীর মিশ্রণে গঠিত সম্পদ (Tangible or financial and tangible) এসপিভির নিকট হস্তান্তর করবে।
৩. এসপিভি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সিকিউরিটাইজ করে বিনিয়োগপত্র ইস্যু করবে যা এসেট-বেকড সিকিউরিটিস নামে পরিচিত।
৪. এ ধাপে এসপিভি সিকিউরিটিসগুলো আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের নিকট বিক্রি করবে।
৫. বিনিয়োগকারীগণ সিকিউরিটিসের বুক ভ্যালু বা লিখিত মূল্য পরিশোধ করবে।
৬. বিনিয়োগকারীদের থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে এসপিভি অরিজিনেটরকে সংশ্লিষ্ট সম্পদের ক্রয়মূল্য পরিশোধ করবে।[২৬]

উপর্যুক্ত চিত্রের ব্যাখ্যা থেকে সম্পদ সমর্থিত কনভেনশনাল ও ইসলামিক সিকিউরিটিসের মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্য সুস্পষ্ট হলো। প্রথম ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এসেট হিসেবে উসূলযোগ্য ঋণ তথা Receivables ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ পূর্বের ঋণকে সিকিউরিটাইজ করে কম মূল্যে পুনবিক্রি করা হয়। এভাবে একাধিকবার ঋণের ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে, যার ফলে মন্দাসহ অর্থনীতিতে নানাবিধ সংকটের জন্ম হয়। ঋণপত্রের এ জাতীয় অবাধ লেনদেনই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ। স্বভাবতই ইসলামী অর্থ আইন এ ধরনের লেনদেনকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। অপরদিকে ইসলামী সিকিউরিটাইজেশনের ক্ষেত্রে শরীরী বা প্রকৃত সম্পদকেই সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং উক্ত সম্পদের ঝুঁকি-আয়ের উপর বিনিয়োগপত্রের ঝুঁকি-আয় নির্ভর করে। কখনো প্রয়োজনের তাগিদে প্রকৃত সম্পদের সাথে আর্থিক সম্পদের সংমিশ্রণ করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশের বেশি না হওয়ার শর্তারোপ করা হয়।

অতএব, নিম্নোক্ত সারণীর মাধ্যমে সম্পদ সমর্থিত কনভেনশনাল ও ইসলামিক সিকিউরিটিসের মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্য তুলে ধরা যায় :

---

২৫. Ibid, p. 189
২৬. Ibid, p. 192

পার্থক্যের বিষয়	সম্পদ সমর্থিত কনভেনশনাল সিকিউরিটিস	সম্পদ সমর্থিত ইসলামিক সিকিউরিটিস
সম্পদ ও বিক্রয়ের ধরন	উসূলযোগ্য ঋণের (receivables) সত্যিকার বিক্রয়।	ইস্যুকারীর শরীয়াহ্সম্মত শরীরী সম্পদের সত্যিকার বিক্রয়।
এসপিভি (SPV)-এর মালিকানার ধরন	স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) বিনিয়োগপত্রে উল্লেখিত মূল্যের সমপরিমাণ ঋণের মালিকানা লাভ করবে।	স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) একজন ট্রাস্টির ভূমিকা পালন করবে।
বিনিয়োগকারীর মালিকানার ধরন	বিনিয়োগকারী বিনিয়োগপত্রে উল্লেখিত মূল্যের সমপরিমাণ ঋণের মালিকানা লাভ করবে।	বিনিয়োগকারী বিনিয়োগপত্রে উল্লেখিত মূল্যের সমপরিমাণ এসেটের মালিকানা লাভ করবে।
ইস্যুকৃত সিকিউরিটিসের সংখ্যা	বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে বিভিন্ন খাতের (Multiple Trenches) হয়ে থাকে।	একই ধরনের এবং সমমূল্য ও সমান অধিকার সম্বলিত।
লভ্যাংশ ও ঝুঁকি	সুদের হার অনুযায়ী লভ্যাংশ পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে।	লাভ-ক্ষতি, ঝুঁকি সুকূকধারী ও ইস্যুকারীর মধ্যে অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে বণ্টিত হয়।
শরীয়াহ্ সুপারভাইজারী কমিটি	শরীয়াহ্ সুপারভাইজারী কমিটি থাকা আবশ্যক নয়।	শরীয়াহ্ সুপারভাইজারী কমিটি থাকা আবশ্যক।
SPV-এর তারল্য আধিক্যের বিনিয়োগ	শরীয়াহ্ অননুমোদিত যে কোন বন্ডে বিনিয়োগ করা যায়।	পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যায়।
SPV-এর তারল্য ঘাটতি পূরণ	সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ।	সুদবিহীন ঋণ গ্রহণ।
মেয়াদান্তে সম্পদ প্রত্যর্পণ	সংশ্লিষ্ট ঋণ ইস্যুকারীর নিকট পুনর্বিক্রয় করা হবে না।	মূল ইস্যুকারীকে সম্পদ পুনরায় ক্রয়ের এখতিয়ার (خيار الشراء)[২৭] দেয়া হয় এবং বাজার দরে বা পূর্বে কৃত চুক্তি অনুযায়ী বিক্রি করা হয়।
সিকিউরিটিস ইস্যুকারী ও বাহকের মধ্যকার সম্পর্ক	ঋণ গ্রহীতা ও ঋণদাতার সম্পর্ক।	অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক।

সারণী ০৩ : সম্পদ সমর্থিত কনভেনশনাল ও ইসলামিক সিকিউরিটিসের পার্থক্য[২৮]

সুকূক ইস্যুকরণে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ

একাধিক পক্ষের সামগ্রিক প্রচেষ্টার সমন্বয়ে সুকূক ইস্যু করা হয়। সাধারণত সুকূক ইস্যুকরণে নিম্নবর্ণিত পক্ষসমূহের সংশ্লিষ্টতা আবশ্যক :[২৯]

১. **প্রকল্প প্রদানকারী (Contract Awarder)** : সাধারণত সরকার বা বড় বড় কোম্পানি কর্তৃক একক বা যৌথভাবে উন্মুক্ত নিলামে বিভিন্ন প্রকল্পের টেন্ডার

---

২৭. খিয়ারুশ শিরা' (خيار الشراء) অর্থ ক্রয়ের স্বাধীনতা। অর্থাৎ মূল ইস্যুকারীকে সংশ্লিষ্ট সম্পদ পুনরায় ক্রয় করা বা না করার স্বাধীনতা দেয়া।

২৮. ফুয়াদ মুহাম্মদ আহমদ মুহাইসীন, *আস-সুকূক আল-ইসলামিয়্যাহ (আত্-তাওরীক) ওয়া তাতবীকাতুহাল মুআসারাহ ওয়া তাদাউলুহু*, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহে অনুষ্ঠিত ওআইসি অধিভুক্ত মাজমা' আল-ফিকহ আল-ইসলামীর ১৯ তম অধিবেশনে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র, ২৬-৩০ এপ্রিল, ২০০৯, পৃ. ৫৩

২৯. Rosly, *Islamic Capital Market*, ibid, p. 97.

দেয়া হয়। এ সব প্রকল্প বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেয়া হয়ে থাকে, যেমনঃ বিল্ড এন্ড ট্রান্সফার (BT), বিল্ড-অপারেট-ট্রান্সফার (BOT), বিল্ড-ওয়ান-অপারেট (BOO), বিল্ড-লীজ-ট্রান্সফার (BLT) ইত্যাদি। কখনো কখনো সরকার এ সকল প্রকল্পের অধীনে ইস্যুকৃত সুকূকের জন্য গ্যারান্টি দিয়ে থাকে।

২. **ফান্ড সরবরাহকারী (Sponsors)** : উপরিউক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী পক্ষ এর জন্য ফান্ড সংগ্রহসহ যাবতীয় কাজ বাস্তবায়নের কার্যক্রম সমন্বয় করে এবং তা ব্যক্তি বিশেষ বা কোম্পানি অথবা যৌথ হতে পারে, যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রেডিট বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ পক্ষই মূলত প্রকল্পের সম্ভাব্য মডেল, নগদ প্রবাহ, শর্তাবলি ইত্যাদি তৈরী করে থাকে।

৩. **স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (SPV)** : বিশেষ একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তথা সুকূক ইস্যুকরার জন্যই মূলত এ জাতীয় কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কোম্পানিই প্রকল্প পরিচালনা ও সুকূক ইস্যু করে থাকে। আইনগত দিক থেকে এ কোম্পানি একটি ব্যাংক ক্রাপসি রিমোট এন্টিটি যা হোল্ডিং বা মূল কোম্পানি থেকে পৃথক একটি সত্তা, যার আর্থিক দায়-দায়িত্বের সাথে মূল কোম্পানির কোন সম্পর্ক নেই। ফলে যদি সুকূক ব্যর্থ হয় এবং বিনিয়োগকারীদের মূলধন ফেরত দেয়ার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তবে মূল কোম্পানি এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য থাকে না।

৪. **প্রধান সমন্বয়কারী/ উপদেষ্টা (Lead Arranger)** : সুকূক ইস্যুকরণে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া, কাঠামো, শর্তাবলি প্রণয়ন, শরীয়াহ অনুমোদন লাভ, রেটিং সংগ্রহ, যথাযথ কার্যপ্রক্রিয়া পর্যালোচনা (Due diligence working process), দস্তাবেজ প্রণয়ন, স্মারক তৈরী সহ সংশ্লিষ্ট সব কাজ লিড এরেঞ্জার সমন্বয় করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী তথা ফান্ড সরবরাহকারীদের পক্ষ থেকে তাদেরই মতামতের ভিত্তিতে এক বা একাধিক করপোরেট কোম্পানিকে লিড এরেঞ্জার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে।

৫. **ট্রাস্টি (Trustee)** : বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে কোন করপোরেট সত্তাকে ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ, দেনা-পাওনা ইত্যাদির নিশ্চয়তা প্রদানের সাথে সাথে ইস্যুকারীর স্বচ্ছতা, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদির গ্যারান্টি প্রদান ট্রাস্ট্রির কাজ। ইস্যুকারী কর্তৃক সুকূক ইস্যু সংক্রান্ত কোন নিয়ম-নীতি বা শর্তের ব্যত্যয় ঘটবে না, ইস্যুকারী ট্রাস্ট দলিল অনুসরণ করে চলবেন তার নিশ্চয়তা প্রদান ও যথাযথ পর্যবেক্ষণ করাও ট্রাস্টি নিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬. **শরীয়াহ উপদেষ্টা** : কনভেনশনাল বন্ড ও সিকিউরিটিসের ইসলামী বিকল্প হিসেবে সুকূক ইস্যুর ক্ষেত্রে শরীয়াহ উপদেষ্টার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুকূক ইস্যুকরণের কোন পর্যায়ে ইসলামী শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু সম্পৃক্ত হয়নি মর্মে

নিশ্চয়তা প্রদান এবং সুকূক ইস্যুকরণের প্রক্রিয়াসমূহের শরীয়াহ পর্যবেক্ষণ করাই মূলত শরীয়াহ্ উপদেষ্টার প্রধান দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শরীয়া বোর্ড এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন অথবা প্রতিষ্ঠানের বাইরের অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। সুকূক ইস্যুকরণের কোন প্রক্রিয়া শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা 'শরীয়াহ রিস্ক' হিসেবে বিবেচিত হয়, যা পরবর্তীতে ক্রেডিট রিস্কের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৭. **রেটিং এজেন্সি :** রেটিং এজেন্সি সুকূকের স্ট্রাকচার, শর্তাবলি, ইস্যুকারীর আর্থিক অবস্থান, অর্থ ফেরত দেয়ার ক্ষমতার মাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা করে সুকূকের রেটিং করে থাকে।

৮. **রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ :** রেগুলেটরি বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সিকিউরিটিস কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ ইত্যাদির সংস্থা একক বা যৌথভাবে সুকূক ইস্যুর ক্ষেত্রে রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে থাকে।

৯. **বিনিয়োগকারী :** সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণ সুকূকে বিনিয়োগ করে থাকে। যেমনঃ ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড, কর্পোরেশন ইত্যাদি। ফাইনান্সিয়াল প্ল্যানারের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়েও সুকূকে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

১০. **অন্যান্য উপদেষ্টা :** সুকূক ইস্যুর সাথে আরও কিছু উপদেষ্টা জড়িত থাকতে পারে। যেমন সলিসিটরস, রিপোর্টিং একাউন্টেন্ট, আন্ডার-রাইটারস প্রমুখ।

সুকূক ইস্যুকরণে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

সাধারণত সুকূক ইস্যুকরণের ক্ষেত্রে যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় তা নিম্নরূপ: [৩০]

১. দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান (Award of Mandate)

সুকূক ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সুকূক ইস্যু করার ক্ষমতা প্রদান করেন। স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে পেশকৃত প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রধান কার্যনির্বাহী (Lead Arranger) নিয়োগ করা হয়। পেশকৃত প্রস্তাবনায় সাধারণত সুকূকের কাঠামো, গঠন প্রক্রিয়া, উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, সুকূকের চূড়ান্ত কাঠামো, বিস্তারিত শর্ত-শরায়েত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থাও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

---

৩০. মোহাম্মদ ইজহার পাওয়ানচেক, *সুকূক ইস্যুয়েন্স প্রসেস*, মালয়েশিয়া : ব্যাংক ইসলাম, ২০০৮.

ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রধান কার্যনির্বাহী নিয়োগ দেয়ার পর সংশ্লিষ্ট অপর পক্ষগুলো যেমন, উকিল (solicitor), শরীয়াহ উপদেষ্টা, হিসাবরক্ষক, ট্রাস্টি, রেটিং এজেন্সি নির্দিষ্ট করা হয়।

২. যথাযথ পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা (Due Diligence Reviews)

এ ক্ষেত্রে পর্যালোচনা ও পুন:র্বিবেচনার মূল উদ্দেশ্য হলো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নিয়মাবলি, নির্দেশনা তথা গাইডলাইন, শরীয়াহ নীতিমালা ইত্যাদির যথাযথ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ নিশ্চিত করা। এ পরিসরে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের আইনগত অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থানসহ আনুষঙ্গিক সব বিষয় পুনর্বিবেচনা করা হয়। সুকূকের চূড়ান্ত কাঠামো, আকৃতি ও বিস্তারিত শর্তাবলিও এ পর্যায়ে পুনর্বিবেচনা করা হয়। পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনার এ কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইস্যুকারী, প্রধান কার্যনির্বাহী, সলিসিটার, শরীয়াহ উপদেষ্টা, হিসাবরক্ষক, ট্রাস্টি, রেটিং এজেন্সির সমম্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পর্যালোচনা ও পুন:র্বিবেচনার এ কাজটি সুকূক ইস্যুর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল ধাপে নিয়মিত সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

৩. রেটিং (Rating)

সুকূককে লেনদেন উপযোগী করার জন্য সুপরিচিত ও গ্রহণযোগ্য রেটিং এজেন্সির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে উপযুক্ত রেটিং সংগ্রহ করতে হয়। জাতীয় পর্যায়ে লেনদেনের জন্য ইস্যুকৃত সুকূকের জন্য স্থানীয় তথা জাতীয় রেটিং এজেন্সি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লেনদেনের জন্য ইস্যুকৃত সুকূকের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত রেটিং এজেন্সি থেকে রেটিং সংগ্রহ করতে হবে। একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সুকূকের মূল্যায়ন তথা রেটিং করায় একে বিনিয়োগকারীদের নিকট লোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফলশ্রুতিতে তারা বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। মৌলিকভাবে রেটিংয়ের ক্ষেত্রে ইস্যু করার নিমিত্তে প্রস্তাবিত সুকূকের গঠনপ্রকৃতি, প্রধান প্রধান শর্ত, ইস্যুকারীর আর্থিক অবস্থা, লেনদেন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রকল্প, আর্থিক ও প্রশাসনিক রিস্ক ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়। তদুপরি সময়মত লাভ বণ্টন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে সময়মত মূলধন ফেরত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় আনা হয়।

অতএব, রেটিংয়ের মানদণ্ডের ভিন্নতার কারণে সুকূকের রেটিংও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেটিং এজেন্সি প্রস্তাবিত সুকূকের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় তারা একটি প্রাথামিক রেটিং দিয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে প্রস্তাবিত সুকূকের চূড়ান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করত একটি চূড়ান্ত রেটিং দিয়ে থাকে। সুকূকের মূল্যমান নির্ধারণ, লভ্যাংশ বণ্টন ও চাহিদা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদিতে রেটিং এর ভূমিকা অপরিসীম। যার রেটিং যত ভাল তার ঝুঁকি তত কম। যা লভ্যাংশের হার ও চাহিদা বৃদ্ধিকরণে একটি নিয়ামক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

বিপরীত পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের রেটিং মূলত উচ্চ ঝুঁকির দিকে ইঙ্গিত করে; যার ফলে মুনাফার হার ও চাহিদার ঘাটতি দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে একসময় সুকুক তার গ্রহণযোগ্যতা ও লেনদেনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। এ কারণে রেটিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুকুকের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজনীয় একটি দিক। বিভিন্নভাবে সুকুকের গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্যমান বৃদ্ধি করা যায়। যেমন ব্যাংক গ্যারান্টি, কর্পোরেট গ্যারান্টি, পুট অপশন, সম্পত্তি পরিবর্তন, বিনিয়োগকারীদের অধিকার ও লভ্যাংশ নির্ধারণ, সিংকিং ফান্ড প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

৪. তথ্যস্মারক প্রস্তুতকরণ (Preparation of Information Memorandum)

সুকূক ইস্যুকরণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যসম্বলিত একটি স্মারক প্রস্তুত করা হয়ে থাকে, যা ইস্যুকরণের সাথে জড়িত সব পক্ষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রয়োজনে বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও তা বিতরণ করা হয়ে থাকে। যাতে বিনিয়োগ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়। তথ্যস্মারকে সাধারণত যে সব তথ্য উল্লেখ করা হয়:

* সুকূকের কাঠামো, প্রকৃতি ও শর্তাবলি।
* ইস্যুকারীর কর্পোরেট, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক অবস্থান ইত্যাদির বিবরণ।
* সুকূক ইস্যুকরণের উদ্দেশ্য।
* কোন প্রকল্পের ফান্ড সংগ্রহের নিমিত্তে সুকূক ইস্যু করা হলে উক্ত প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ, নগদ প্রবাহ, প্রত্যাশিত রাজস্ব ও আয় ইত্যাদি।

৫. বিনিয়োগকারীদের অধিকার সংরক্ষণ (Securing Participants/investors)

বিনিয়োগকারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুকূক ইস্যুর প্রাক্কালে আন্ডাররাইট ও গ্যারান্টরদের অংশগ্রহণের জন্য আহবান করা হয়ে থাকে। যাতে তারা সাধ্যানুযায়ী সুকূক ইস্যু করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট রেগুলেটরস ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের পূর্বে অবশ্যই আন্ডাররাইটার ও গ্যারান্টর চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হতে হয়। এমনকি রেটিং এর আবেদনের পূর্বে চূড়ান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. শরীয়াহ অনুমোদন (Shari'ah Approval)

সুকূক ইস্যুকরণের যাবতীয় কার্যক্রম, গঠনপ্রকৃতি, সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি সব কিছুই গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত একটি শরীয়াহ কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অথবা তৃতীয় কোন স্বাধীন শরীয়াহ কমিটির মাধ্যমে এ অনুমোদন নেয়া যেতে পারে। শরীয়াহ কমিটি এ মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করবে যে, সংশ্লিষ্ট সুকূক ইস্যুকরণের কোন পর্যায়ে ইসলামী শরীয়াহ বহির্ভুত বা এর সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু নেই।

৭. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন (Submission to the Respective Authorities)

এ পর্যায়ে সুকূক ইস্যুকরণের অনুমোদন চেয়ে সংশ্লিষ্ট রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অনুমোদনের নিমিত্তে আবেদনের পূর্বে অবশ্যই উপরিউক্ত ধাপগুলো সফলতার সাথে সমাপ্ত করতে হবে। অনুমোদনের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত তথ্যাবলি ও নথিপত্র পেশ করতে হয় (অবশ্যই স্থান কাল ও পাত্র ভেদে এর মধ্যে ভিন্নতা আসতে পারে) :

* ইস্যুকারী ও প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা ও প্রজ্ঞাপন।
* ইস্যুকারীর কর্পোরেট তথ্যাবলি ও সর্বশেষ অডিটকৃত একাউন্টস।
* সুকূকের পরিকাঠামো ও মৌলিক শর্তাবলি।
* শরীয়াহ্ কমিটির প্রত্যয়নপত্র।
* রেটিং এজেন্সির প্রত্যয়নপত্র।

৮. আইনগত দস্তাবেজ প্রস্তুতকরণ (Legal Documentation)

সংশ্লিষ্ট ও অনুমোদিত আইনজীবীর মাধ্যমে সুকূক ইস্যুসংক্রান্ত লিগ্যাল ডকুমেন্টস্ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সাধারণত সুকূক ইস্যুসংক্রান্ত লিগ্যাল ডকুমেন্টে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে :

* সুবিধা চুক্তি (Facility agreement)
* ট্রাস্ট দলিল (Trust deed)
* আমানাত গ্রহণ ও অর্থ প্রদান সম্পর্কিত প্রতিনিধিত্ব চুক্তি (Depository and paying agency agreement)
* টেন্ডার পেনেল এগ্রিমেন্ট (যেখানে প্রযোজ্য)
* নিরাপত্তা চুক্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (Security agreement)
* অন্যান্য চুক্তি (যেখানে প্রযোজ্য)।

৯. সুকূক ইস্যু (Issue of Sukuk)

উপরিউক্ত ধাপগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন ও লিগ্যাল ডকুমেন্ট তৈরির পর সুকূক ইস্যুর জন্য পূর্ণভাবে প্রস্তুত বলে বিবেচনা করা হয় এবং সর্বশেষ ধাপ হিসেবে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত বিশেষ চ্যানেলের মাধ্যমে বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা সুকূকে বিনিয়োগ করে থাকেন।

সুকূক ইস্যুকরণের জন্য উপরে আলোচিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয় :
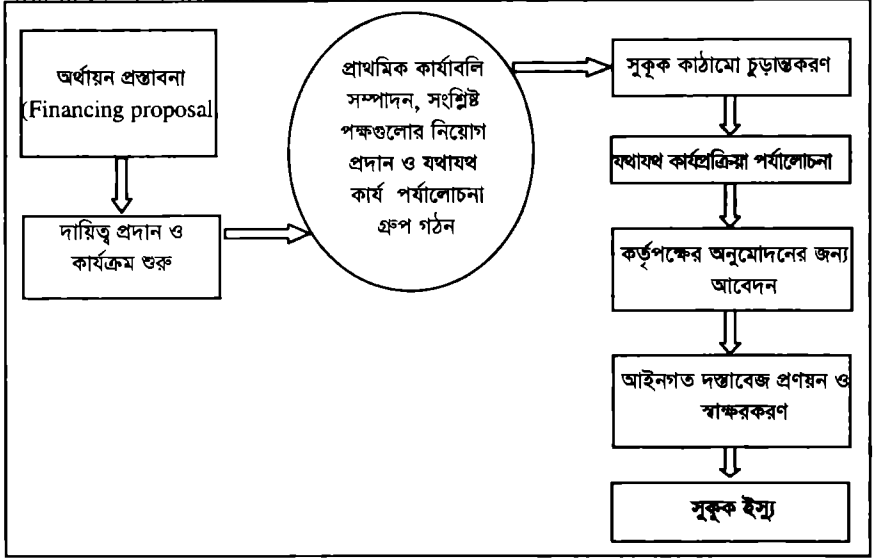
চিত্র ০৪ : সুকূক ইস্যু কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা[৩১]

সুকূকের গঠন-কাঠামো

সুকূক ইস্যুকরণে ব্যবহৃত শরীয়াহ চুক্তির ভিন্নতার কারণে সুকূকের গঠন কাঠামোও ভিন্ন হয়ে থাকে। মৌলিকভাবে একটি প্রতীকী (Typical) সুকূকের গঠন-কাঠামো নিম্নরূপ হয়ে থাকে :
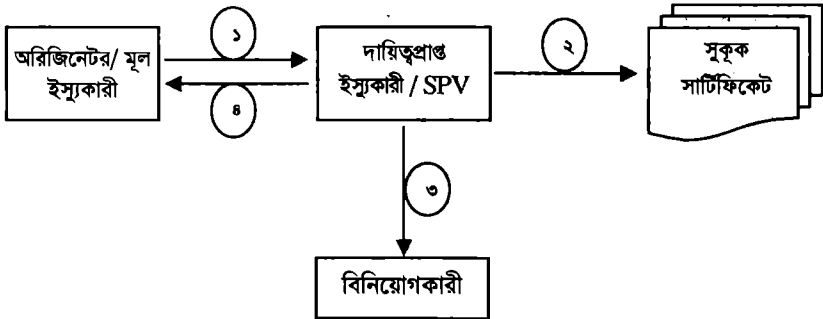
চিত্র ০৫: সুকূকের সাধারণ গঠন কাঠামো[৩২]

---

৩১. গবেষকগণের নিজস্ব চিত্রায়ণ

৩২. গবেষকগণের নিজস্ব চিত্রায়ণ

১. অরিজিনেটর তথা প্রকল্প প্রদানকারী প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সুকূক ইস্যু করার নিমিত্তে শরীয়াহসম্মত একটি সম্পদের মালিকানা ইস্যুকারীর নিকট হস্তান্তর করবে।

২. ক্রয়কৃত এসেটটির মালিকানার উপর ভিত্তি করে ইস্যুকারী সুকূক ইস্যু করবে।

৩. সুকূক ইস্যু করার পরে ইস্যুকারী তা বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রয় করবে, যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট এসেটে সমমান মূল্যের অভিন্ন মালিকানা লাভ করবে এবং তা থেকে আগত লাভ-ক্ষতির অংশীদার হবে।

৪. এসপিভি বিনিয়োগকারীদের থেকে সংগৃহীত ফান্ড দিয়ে অরিজিনেটরের সম্পদের মূল্য পরিশোধ করবে। সুকূকের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে অরিজিনেটর পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে, কিংবা বাজার দরে, কিংবা সার্টিফিকেটে লিখিত মূল্যে সুকূকগুলো পুন:ক্রয় করবে এবং এর মাধ্যমে সুকূকের পরিসমাপ্তি ঘোষণা হবে।

সুকূক ইস্যুকরণের শরীয়াহ্ নীতিমালা

সিকিউরিটাইজেশন (Securitization) শব্দের توريق، تسنيد ও تصكيك আরবী এ তিনটি প্রতিশব্দ রয়েছে। আধুনিক এ পরিভাষাগুলোর ব্যবহার ইসলামের প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী যুগের ফিক্‌হ গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায় না। অন্তত পক্ষে বর্তমান সময়ের সিকিউরিটাইজেশনের মূল ধারণার সাথে সঙ্গত কোন অর্থে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। তাওরীক (توريق) শব্দটি ওয়ারিক (ورق) মূলধাতু থেকে নির্গত আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা নগদায়ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওয়ারিক দ্বারা রৌপ্যমুদ্রা বা দিরহাম বুঝানো হয়, পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহফের ঘটনায় শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

"তোমাদের একজনকে এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর।"[৩৩]

বর্তমান সময়ে তাওরীক দ্বারা বুঝায়, Transforming a deferred debt, for the period between the establishment of the debt and the maturity period, into papers which can be traded in the secondary market.

"বিলম্বে উসূলযোগ্য ঋণকে ঋণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে শুরু করে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার মধ্যকার সময়ের জন্য সেকেন্ডারি মার্কেটে বেচাকেনার উপযুক্ত কাগুজে সনদে পরিণত করা।"[৩৪]

---

৩৩. আল-কুরআন, ১৮ : ১৯

৩৪. Securities Commission Malaysia, *The Islamic Securities (Sukuk) Market*, p. 7.

পক্ষান্তরে, তাসনীদ (تسنيد) শব্দটি سند থেকে এসেছে, যার আভিধানিক অর্থ সনদ বা বন্ড প্রণয়ন করা। পরিভাষায় তাসনীদ বলা হয়, Transformation of illiquid debt into negotiable papers. "অতরল ঋণকে হস্তান্তরযোগ্য পেপারে পরিবর্তন করা।"[৩৫] হস্তান্তরযোগ্য পেপারকে সনদ বা বন্ড বলা হয়।
অপর আরবী পরিভাষাটি হল, তাসকীক (تصكيك) বা Securitization এ শব্দটি সাক্কুন থেকে এসেছে। ইতঃপূর্বে শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে।

সুকূক বা ইসলামী বিনিয়োগ সনদের মূল ধারণা লাভ-ক্ষতিতে অংশিদারত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেনদেনে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অর্থায়ন করা। যা ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিখ্যাত সূত্র الغنم بالغرم এর আলোকে সম্পন্ন হয়।[৩৬]

সুকূক ইস্যুর শরয়ী বৈধতা

তাওরীক পদ্ধতির শরীয়াহ্ অভিযোজন (Shariah Adaptation) করে এর সাথে ইসলামী শরীয়াতের বৈধ কোন আর্থিক চুক্তি সংযুক্ত করে মূলত সুকূক ইস্যু করা হয়। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত অন্য সব বিষয় বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের মৌলিক বিধান হচ্ছে, যদি কুরআন, সুন্নাহ বা অন্য কোন দলিলের ভিত্তিতে এর অবৈধতা প্রমাণিত না হয় তবে তা বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ইসলামী আইনী সূত্র বা কায়িদা ফিকহিয়্যাহ (Islamic Legal Maxim) অনুযায়ী যে কোন কন্ট্রাক বা চুক্তির মৌলিক বিধান হলো বৈধতা।[৩৭]

মহান আল্লাহ্ বলেন :

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"পৃথিবীতে যা কিছু আছে এর সবকিছুই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"।[৩৮]

---

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. الغنم শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্যাণ, মুনাফা, উপকার; পক্ষান্তরে الغرم অর্থ ঋণ, অপরিহার্য কোন কিছু বা অবশ্যই আদায় করতে হবে এমন বিষয়, দায় ইত্যাদি। কায়িদাটি মূলত মহানবী স.-এর হাদীস لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه অর্থাৎ বন্ধকী সম্পদ এর স্বত্বাধিকারী যে বন্ধক রেখেছে তার থেকে মুক্ত হয়ে যায় না, তাকে এর কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়টি নিতে হয়। অতএব সূত্রটির অর্থ দাঁড়ায়, "লাভ-ক্ষতি উভয়ই বহণ করতে হবে" বা "মুনাফা ও ঝুঁকি উভয়ে অংশিদারিত্ব"

৩৭. সূত্রটি: (الأصل في العقود/ المعاملات الإباحة) (The norm in transactions is that of permissibility), বিস্তারিত দেখুন : আযমান ইসমাঈল ও মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *Islamic Legal Maxims, Essentials and Applications*, (Kuala Lumpur : IBFIM, 2013), pp. 69-73

৩৮. আল-কুরআন, ০২ : ২৯

উক্ত আয়াতে বর্ণিত "লাকুম" অর্থাৎ তোমাদের জন্য, তোমাদের ব্যবহারের জন্য, এ শব্দটি সাধারণত বৈধতার ইঙ্গিত বহন করে, যতক্ষণ না অন্য কোন বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلّ حراما

"মুসলিম স্বীয় শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য, যতক্ষণ না তার শর্ত কোন হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালে পরিণত করে"।[৩৯]

অর্থাৎ যে শর্তের মাধ্যমে হালাল বিধানকে হারাম এবং হারাম বিধানকে হালাল করা হয় সে শর্ত কোন মুসলিম পালন করতে বাধ্য নয়।

অতএব, উপরিউক্ত দলিলের আলোকে বলা যায়, সুকূক ইস্যুকরণ এবং এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি বৈধ হবে, যতক্ষণ না এতে ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিষয় জড়িত হয়। এ জন্য সুকূক ইস্যুকরণ ও লেনদেনের সব স্তরেই শরীয়াহ পরিপালনের বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হয়। সুকূকের স্তরে শরীয়াহ পরিপালনের নীতিমালা নিম্নরূপ :

ক. ইস্যুকরণের সময় করণীয়

১. সুকূক ইস্যুকরণের জন্য যে সম্পদ নির্দিষ্ট করা হয় উক্ত সম্পদ অবশ্যই ইসলামী শরীয়াহসম্মত হতে হবে।

২. সংশ্লিষ্ট সম্পদ/ সম্পদের উপস্বত্ব/সেবা যার বিপরীতে সুকূক ইস্যু করা হয়, তাতে সুকূকধারীর জন্য নির্ধারিত অংশের অধিকার ও দায়সহ সুকূকের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে।

৩. ক্রয়-বিক্রয় ও লীজের ভিত্তিতে ইস্যুকৃত সুকূকের ক্ষেত্রে ইস্যুকারী একপক্ষীয় শর্তারোপ করতে পারবে যে, এক বছর পরে নির্ধারিত একটি মূল্যে সে সংশ্লিষ্ট সম্পদ কিনে নিতে পারবে।

৪. বিভিন্ন ধরনের রিজার্ভ ফান্ড, যেমন প্রফিট ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভ (PER), তাকাফুল ফান্ড গঠন করা যাবে।

৫. যে শরীয়া চুক্তির ভিত্তিতে সুকূক ইস্যু করা হবে উক্ত চুক্তি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় নিয়ম-নীতি অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

---

[৩৯] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* বিশ্লেষণ : আহমদ মোহাম্মদ শাকের ও অন্যান্য, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : মা জুকিরা ফীস সুলহি বাইনান নাস, বৈরূত : দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, খ. ৩, পৃ. ৬৩৪, হাদীস নং-১৩৫২

৬. একটি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ইস্যুকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। যারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শরীয়াহ বিশ্লেষণ করবেন।

খ. সুকূক ক্রয়-বিক্রয় তথা লেনদেনের সময় করণীয়

১. সেকেন্ডারি মার্কেট সুকূক ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়াহ পরিপালনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা।

২. সাধারণ অবস্থায় ইস্যুকারী অবশ্যই সুকূক সার্টিফিকেটে উল্লিখিত মূল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না, তবে অবহেলা বা অমনোযোগিতার ক্ষেত্রে ইস্যুকারীকে অবশ্যই এর দায়ভার বহন করতে হবে।

৩. ঐ সব সুকূক বাজারজাত করা যাবে যেগুলো প্রকৃত সম্পদ, সম্পদের উপস্বত্ব ও সেবায় অভিন্ন অংশীদারের ভিত্তিতে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ যেসব সুকূক উসূলযোগ্য বিলে (Receivables) মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলো বাজারজাত করা যাবে না।

৪. সুকূক ইস্যু, বাহকদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণ, বিতরণ ও প্রকল্প শুরু হওয়ার পরেই কেবল সুকূক বাজারজাত ও পরিসমাপ্তি বৈধ হবে।

৫. যে শরীয়াহ চুক্তির ভিত্তিতে সুকূক ইস্যু করা হয়েছে সে চুক্তির অন্তর্বর্তীকালীন সব বিধি-বিধান মেনে চলা।

৬. সুকূক ব্যবস্থাপক মুদারিব বা অংশীদার (Partner) বা প্রতিনিধি (وكيل) যাই হোন না কেন সুকূকের প্রত্যাশিত মুনাফার তুলনায় বাস্তব মুনাফা কম হলে সুকূকধারককে ঋণ দিতে বাধ্য থাকা বৈধ হবে না। তবে শরীয়াহ মানদণ্ড ১৩ এর ৮/৮ ধারার আলোকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যাশিত মুনাফা বণ্টন করা যেতে পারে।

৭. সুকূকের তারল্যের আধিক্য বা ঘাটতি ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র শরীয়াহ অনুমোদিত ক্ষেত্রে ও শরীয়াহভিত্তিক ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

গ. মুনাফা বণ্টন ও সুকূকের পরিসমাপ্তি

১. সুকূক মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর এর পরিসমাপ্তির পদ্ধতি অবশ্যই শরীয়াহসম্মত হতে হবে।

২. মুনাফা বণ্টন অবশ্যই লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট হারে প্রদান করা হবে। অর্থাৎ প্রকল্প শেষে পুঁজিপতি বা রাব্বুল মাল হিসেবে সুকূকধারক ও মুদারিব হিসেবে ইস্যুকারীর মধ্যে লাভ-ক্ষতি নির্দিষ্ট হারে বণ্টিত হবে।

৩. সুকূকের মেয়াদান্তে সংশ্লিষ্ট সম্পদ যদি ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করা হয়, তবে তা ১.৩৩% এর বেশি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে যদি বিক্রিয় মূল্য ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে ০.৬৭% এর কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. সংশ্লিষ্ট সম্পদের বাজার দর নির্ধারণে জটিলতা দেখা গেলে একটি ন্যায়সঙ্গত মূল্য যা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই নিট দাপ্তরিক মূল্যকে (Net book value) পুনঃগ্রহণ কাম্য নয়।[৪০]

সুকূক ইস্যু ও লেনদেনের ক্ষেত্রে বর্জনীয়

১. **রিবা (সুদ) :** পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন স্থানে অকাট্য ও কঠিনভাবে সুদকে হারাম করা হয়েছে। ক্রয়-বিক্রয় তথা লেনদেনে যে কোন প্রকারের অতিরিক্ত অংশ যা কোন প্রকার বিনিময়, প্রতিদান, কাউন্টার ভেল্যু ব্যতীত আদান-প্রদান করা হয় তাই সুদ বলে বিবেচিত।

২. **গারার (অনিশ্চয়তা) :** সব ধরনের অনিশ্চয়তা যা পরবর্তীতে লেনদেন সংশ্লিষ্ট দু'পক্ষের মধ্যে অনৈক্য, বিবাদ, ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করার সমূহ সম্ভাবনা রাখে, তা ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ এবং এ জাতীয় অনিশ্চয়তা ক্রয়-বিক্রয়সহ সব চুক্তিকে অবৈধ করে দেয়। তবে সামান্য পরিমাণ অনিশ্চয়তা, যা কোন প্রকারের অনৈক্য বিবাদের দিকে ধাবিত করে না তার উপস্থিতি লেনদেনকে অবৈধ করে না।

৩. **অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা :** সূদের লেনদেন ও গারার ইত্যাদি ছাড়াও যে সব বিষয় ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ, সুকূকের লেনদেনের ক্ষেত্রে এ সব বিষয়ের কোন সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না। যেমন জুয়া, শূকর, নেশাজাতীয় দ্রব্য প্রভৃতির লেনদেন। কেননা এগুলো মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে হারাম করেছেন।[৪১] অতএব সুকূক ইস্যু করার মাধ্যমে হারাম কাজে বা হারাম ব্যবসায় জড়িত কোন ইন্ডাস্ট্রি বা প্রকল্পের ফান্ড সংগ্রহ করা যাবে না।

---

৪০. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : সাফিয়্যাহ আহমদ আবূ বকর, "আস্-সুকূক আল-ইসলামিয়্যাহ", আল-মাসারিফ আল-ইসলামিয়্যাহ বাইনাল ওয়াকি' ওয়াল মা'মূল কন্ফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, দুবাই : দায়েরাতুস শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল আমালিল খায়রী, ৩১ মে-৩ জুন, ২০০৯, পৃ. ২২-২৪; মুহাইসীন, *আস-সুকূক আল-ইসলামিয়্যাহ (আত্-তাওরীক) ওয়া তাতবীকাতুহাল মুআসারাহ ওয়া তাদাউলুহু*, পৃ. ২৬-৪০; শরীয়াহ মানদণ্ড নং ১৭, পৃ. ২৯১-২৯৭; Securities Commission Malaysia, *The Islamic Securities (Sukuk) Market*, p. 31.

৪১. আল-কুরআন, ৫ : ৩, ৯০

উপসংহার

সুকূক বা ইসলামী বিনিয়োগপত্র একটি আধুনিক পরিভাষা। তবে উমাইয়া ও উসমানী খিলাফতে সমজাতীয় কিছু মালিকানা পত্রের প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি হাদীসে শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। একাধারে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী অর্থপত্র হিসেবে সুকূকের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যা একে একদিকে কনভেনশনাল বন্ড থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অন্যদিকে শেয়ার থেকেও আলাদা করেছে। যে সম্পদকে কেন্দ্র করে সুকূক ইস্যু করা হয় উক্ত সম্পদ, শরয়ী চুক্তি, বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুকূককে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। ইসলামী ও কনভেনশনাল সিকিউরিটাইজেশনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, কনভেনশনাল পদ্ধতিতে উসূলযোগ্য ঋণের বিপরীতে সিকিউরিটিস ইস্যু করা হয়; কিন্তু ইসলামী শরীয়াহ এ জাতীয় লেনদেনের অনুমতি দেয় না বিধায় নির্দিষ্ট সম্পদের বিপরীতে ইসলামী সিকিউরিটিস ইস্যু করা হয়। সুকূক ইস্যুকরণের প্রতিটি স্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে শরীয়াহ পরিপালন করতে হয়, ফলে ইস্যুকরণ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পক্ষের মধ্যে একটি বৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়। পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী আইনী সূত্র বা ফিকহী কায়িদার ভিত্তিতে সুকূক ইস্যুকরণের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এর ইস্যুকরণ, লেনদেন, পরিসমাপ্তি ও লাভ-ক্ষতি বণ্টন প্রতিটি স্তরে পালনীয় ও বর্জনীয় শরীয়াহ নীতিমালা রয়েছে, যার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এটি একটি পরিপূর্ণ শরীয়াহসম্মত বিনিয়োগপত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৬
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৩

ইসলামী বাণিজ্যিক আইনে রিবা'র পরিধি : একটি পর্যালোচনা

জিয়াউর রহমান মুন্সী*

[সারসংক্ষেপ : *ইসলামী বাণিজ্যিক আইনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. যে ক'টি বিষয়ের উপর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন-সুদ (রিবা) তার অন্যতম। কুরআনে চারটি ধাপ অবলম্বন করে রিবাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আর কুরআনের সর্বজনীন ব্যাখ্যাতা হিসেবে নবী স. রিবা আল-ফাদলকেও নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনে এর সকল পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে তিনি এ মর্মেও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সুদী কারবার নিছক এসব কারবারের মধ্যে সীমিত নয়; বরং তিহাত্তরটি ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় সুদী কারবার সংঘটিত হতে পারে। তবে অষ্টাদশ শতকে বিশ্বজুড়ে ইউরোপীয় উপনিবেশ সম্প্রসারণের বদৌলতে ইউরোপীয় সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের ন্যায় সুদের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কারো কারো দাবি, ইসলাম নিছক মহাজনী সুদকে নিষিদ্ধ করেছে; বর্তমান যুগের বাণিজ্যিক ঋণের উপর আরোপিত সুদ ইসলামের নিষিদ্ধ রিবা'র অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ইসলাম নিছক চক্রবৃদ্ধি সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, সরল সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। বর্তমান প্রবন্ধে ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ রিবা'র ঐতিহাসিক পটভূমি, পরিধি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিতর্ক পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ ও তার উপর সুদ আরোপ বর্তমান যুগের কোনো নতুন উদ্ভাবন নয়; বরং কুরআন নাযিলের বহু আগে থেকেই আসিরীয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম ও সপ্তম শতকের আরবের সর্বত্রই উক্ত প্রথা চালু ছিল এবং এরই প্রেক্ষিতে ইসলাম সকল প্রকার রিবার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তা বাণিজ্যিক হোক কিংবা মহাজনী, সরল কিংবা চক্রবৃদ্ধি।*]

রিবা'র তাৎপর্য

সুদের সমার্থবোধক আরবি শব্দ রিবা। হিব্রুতে রিব্বিত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ 'প্রবৃদ্ধি' বা 'বাড়তি কোনো কিছু'। তবে পারিভাষিক অর্থে রিবা মূলত, সেই বাড়তি অংশ যা কোনো ঋণচুক্তির অধীনে মূলধনের উপর প্রদান করা হয়'।[১] বিশ্বের অন্যতম প্রধান চারটি ধর্মের (ইসলাম, হিন্দু, ইহুদী ও খ্রিস্ট) সবক'টিই সুদের নিন্দা

---

* প্রভাষক, আইন বিভাগ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

১. এডওয়ার্ড ডব্লিউ লেইন, *এন এরাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন*, লন্ডন : উইলিয়ামস এন্ড নরগেট, ১৯৬৩, খ. ৩, পৃ. ১০২৩

করলেও এদের কোনটিই ইসলামের ন্যায় সুদের নিষেধাজ্ঞার ওপর এতোটা জোর প্রদান করেনি এবং সুশৃঙ্খল নিয়মের ভিত্তিতে সুদমুক্ত ও স্বতন্ত্র অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন প্রয়াসও চালায়নি। সুদের নিষেধাজ্ঞার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করার ফলে ইসলাম 'বিশ্বে সুদমুক্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির (Political Economy) সর্বাধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি' বিনির্মাণে সক্ষম হয়েছে।[২]

রিবা'র নিষেধাজ্ঞার চারটি ধাপ ও পটভূমি

আল-কুরআনে আইন প্রণয়নের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য হল কোন কিছু পরবর্তী পর্যায়ে নিষিদ্ধ করতে চাইলে প্রথমে কিছু সহজ-সাধ্য বিধানের মাধ্যমে তার মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরি করা হয়। সুদের নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে; স্থূলমস্তিষ্কের শাসকের ন্যায় হঠাৎ চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে আল-কুরআন এ ক্ষেত্রে চারটি স্বতন্ত্র ধাপ অনুসরণ করেছে।

প্রথম ধাপ : সুদী কারবার সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটায় না

মক্কী যুগের আয়াতসমূহে পার্থিব জীবনের প্রকৃতি, পৃথিবীতে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য ও পরকালীন জবাবদিহিতা- এসব তাত্ত্বিক বিষয়ে মানুষের ধারণার পরিশুদ্ধির উপর মনোনিবেশ করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মু'মিনদেরকে আসন্ন কঠোর আইন-কানুন মেনে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কৌশলের একটি অংশ হিসেবে মক্কী যুগে সুদ সংক্রান্ত প্রথম বিধানটি নাযিল করা হয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে- এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তোমরা যা যাকাত দাও, (তা-ই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে)। বস্তুতপক্ষে তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।"[৩]

এ আয়াতের মাধ্যমে সুদের উপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নি, বরং তাতে জাগতিক লাভের চেয়ে আখিরাতের লাভের কথা উল্লেখ করে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, কারণ লোকেরা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিল যে, সুদ গ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে নিচ্ছে, পক্ষান্তরে যাকাত প্রদানের ফলে তাদের সম্পদ কমে যাচ্ছে। এ আয়াতে সুদ ও যাকাতের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি নিখাঁদ ও সুদৃঢ় ঈমান এবং 'মানবীয় হৃদয়ের

---

২. এ এম ভিসের ওয়েইন ও এলাস্টেইর ম্যাকিন্টস, *এ শর্ট রিভিউ অব দ্যা হিস্ট্রিক্যাল ক্রিটিক অব ইউজারি, একাউন্টিং, বিজনেস এন্ড ফাইনান্সিয়াল হিস্ট্রি,* খ. ৮, নং ২, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৬

৩. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

অধিকারী' লোকদের সুদী কারবার ছেড়ে দেয়ার জন্য এ বক্তব্যই যথেষ্ট ছিল; তবে সাধারণ লোকদের জন্য কঠোরতর আইনের প্রয়েজনীয়তা রয়েই গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ধাপ : সুদের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার দায়ে আল্লাহ ইহুদীদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন- মর্মে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ

সুদ সংক্রান্ত দ্বিতীয় নির্দেশনা নিয়ে আলোচনার পূর্বে এর ঐতিহাসিক পটভূমির উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। যদিও বর্তমান তাওরাত (The Torah) তার আদি বিশুদ্ধতা সহকারে সংরক্ষিত হয়নি, তারপরও এতে এমন কিছু বাক্য[৪] রয়ে গিয়েছে যেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে সুদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে,

"তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমাদের স্বজাতীয় কোন দীন দুঃখীকে টাকা ধার দাও, তবে তার কাছে সুদগ্রাহীর ন্যায় হয়ো না; তোমরা তার উপর সুদ চাপাবে না। যদি তুমি নিজ প্রতিবেশীর বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে সূর্যাস্তের পূর্বে তা ফিরিয়ে দিও; কেননা তা তার একমাত্র আচ্ছাদন, তার গায়ের বস্ত্র; সে কিসে শয়ন করবে আর যদি সে আমার কাছে ক্রন্দন করে, তবে আমি তা শুনব, কেননা আমি কৃপাবান"।[৫]

তবে আশ্চর্যজনকভাবে ইহুদী ও অইহুদীর নিকট থেকে সুদ গ্রহণের মধ্যে একটি পার্থক্যরেখা টানা হয়েছে, প্রথমটির নিন্দা করা হলেও দ্বিতীয়টিকে যথারীতি বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

"তুমি সুদের জন্য-হোক তা অর্থ, খাদ্যসামগ্রী বা অন্য কোন কিছু-কোন ইসরাঈলীয় (ইহুদী) কে ঋণ দিবে না। সুদের জন্য অইহুদীকে ঋণ দিতে পারো, কিন্তু সুদের জন্য কোন ইহুদীকে ঋণ দিবে না"।[৬]

সুদ সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় আয়াতটি নাযিল হয়েছিল মদীনায়। এ স্তরে মুমিনরা সেই ইহুদী জাতির সংস্পর্শে আসে যাদেরকে মূসা আ. এর মাধ্যমে ইতঃপূর্বে 'তাওরাত' নামক বিখ্যাত আইন সংহিতা প্রদান করা হয়েছিল। তাওরাতের মাধ্যমে আল্লাহ ইহুদীদেরকে সুদী কারবার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবে তাদের অধিকাংশই এ নির্দেশের প্রতি মোটেই কর্ণপাত করেনি। আরবের ইহুদীরা উল্টো গোটা অঞ্চলে সুদের জাল বিস্তার করে গোত্রীয় শাসকদেরকে এক প্রকার বন্দী করে রেখেছিল। এ প্রক্রিয়ায় তারা সর্বত্র নিজেদের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে।[৭]

---

৪. যাত্রা পুস্তক ২২ : ২৫-২৭; লেবীয় ২৫ : ৩৫-৩৭; দ্বিতীয় বিবরণী ২৩ : ১৯-২০; নেহিমীয় ৫ : ১০-১১; গীত সংহিতা ১৫ : ৫; মেছাল ২৮ : ৮; ইশাইয়া ২৪ : ১-৩; যিরমীয় ১৫ : ১০ ও যিহিস্কেল ১৮ : ৭-৯, ১৩, ১৭, ২২ : ১২

৫. যাত্রাপুস্তক ২২ : ২৫-৭

৬. দ্বিতীয় বিবরণ ২৩ : ১৯-২০

৭. ইহুদীদের এ অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব নিছক আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তারা যেখানেই পদার্পণ করেছে সেখানেই সুদের জাল বিস্তার করে গোটা জাতির বৃহত্তর সম্পদ নিজেদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। সেখানকার অল্প সংখ্যক

ইহুদীদের এ ধরনের 'সফলতা' কতিপয় মুসলিমের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়; ফলে তাদের কেউ কেউ ইহুদীদের এ সুদী কারবারকে একটি রোল মডেল হিসেবে নিয়ে এর অনুসরণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ঠিক এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আল্লাহ ইতঃপূর্বে ইহুদীদেরকে সুদী কারবার করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তারা তা লঙ্ঘন করেছে, ফলে তিনি তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আল্লাহ বলেন,

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"এবং তাদের সুদ গ্রহণ করার জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে থেকে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি"।[৮]

আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করার দায়ে ইহুদীদের শাস্তি পরকালেই সীমাবদ্ধ নয়, পার্থিব জীবনেই এদেরকে বহুবার ইতিহাসের জঘন্যতম শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

সুদ সংক্রান্ত দ্বিতীয় ধাপের এ সতর্কীকরণের মাধ্যমে কুরআন মুমিনদের সামনে এ কথা প্রকাশ করে দেয় যে, ইহুদীরা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে এসব সম্পদ অর্জন করেছে, আর বিনিময়ে অর্জন করেছে আল্লাহর ভয়ানক ক্রোধ। এ আয়াতের মাধ্যমে একটি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, অচিরেই মুমিনদেরকেও ইহুদীদের ন্যায় সুদের প্রত্যক্ষ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হবে। আর তারা যদি সেই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে তাহলে তাদেরকেও একই পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : চক্রবৃদ্ধি সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা

এ ধাপে এসে মুসলিমদের উপর সুদের প্রত্যক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ – وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ – وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ –

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেওনা এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। এবং সেই আগুনকে ভয় কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পারো"।[৯]

লোকই তাদের সুদী থাবার বাইরে থাকতে সক্ষম হয়েছে। সেকসপিয়রের *দ্যা মার্চেন্ট অব ভেনিস* ইউরোপ জুড়ে তাদের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের একটি ক্ষুদ্র নজির মাত্র।

৮. আল-কুরআন, ৪ : ১৬১

৯. আল-কুরআন, ৩ : ১৩০-১৩২

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই সুদের এই নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বিধান নাযিল করা হয়। যেহেতু উক্ত যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল শত্রুবাহিনীকে গুড়িয়ে দেয়ার কাজ সম্পন্ন করার আগেই গনিমতের মাল-এর উপর মনোনিবেশ করা, সেহেতু স্বার্থপরতা, অমানবিকতা ও লোভের প্রধান উৎস সুদের সামনে একটি সুদৃঢ় বাধার প্রাচীর স্থাপনের জন্য মহান আল্লাহ উহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পরের সময়টিকেই বেছে নেন।

বিখ্যাত মুফাসসির কাফ্ফাল রহ.-এর মতে, "হতে পারে যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসলিমদের মনে এ চিন্তা উঁকি দিয়েছিল যে, সুদী ঋণের মাধ্যমে মক্কার মুশরিকরা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করেছে তা উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে বেশ কাজে লেগেছে; সুতরাং মুসলিমদেরকেও সুদী কারবারে উঠে পড়ে লাগা উচিত, যাতে তা থেকে অর্জিত লাভ মুশরিক ও অন্যান্য খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াইয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। কুরআনের এ নিষেধাজ্ঞা তাদের এ চিন্তাকে শুধরে দেয়।"[১০]

অধিকন্তু এর মাধ্যমে ইহুদীদের সাথে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের ফলে সুদী ঋণের মাধ্যমে বিনা পরিশ্রম ও বিনা ঝুঁকিতে বসে বসে উত্তরোত্তর সম্পদ বৃদ্ধির ইহুদী ফর্মুলা অনুসরণে আগ্রহী কতিপয় ইহুদী-প্রেমিক মুসলিমের চিন্তাধারারও সংশোধন করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞার পূর্বের আয়াতগুলোতে এ অন্তর্নিহিত সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, মুসলিমদের প্রকৃত সফলতা ও বিজয় দুনিয়ার অবৈধ সম্পদের উপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে আল্লাহর অনুগ্রহের উপর ভরসা করে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলার উপর।[১১]

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'চক্রবৃদ্ধি' ক্রিয়া বিশেষণটি সুদী কারবার নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত কিনা- এ নিয়ে এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। সরাসরি এ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন তাফসীরবিদ মাহমুদ আলূসী। তিনি বলেন, "সাধারণ সুদের বৈধতা দিয়ে এ নিষেধাজ্ঞাকে সীমিত করার লক্ষ্যে উক্ত আয়াতে এ ক্রিয়া বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়নি; বরং এটি ব্যবহৃত হয়েছে তৎকালে প্রচলিত প্রথাকে বুঝানোর জন্য"।[১২] বাংলা ভাষায়ও বিশেষণ সব সময় বিশেষিতকে সীমিত করে না; অনেক

---

১০. ফখরুদ্দীন রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮১, খ. ৯, পৃ. ২

১১. রশীদ রিদা, *তাফসীরুল মানার*, আল-কাহেরা : দারুল মানার, ১৯৪৭, খ. ৪, পৃ. ১২২

১২. মাহমুদ আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা. বি. , খ. ৪, পৃ. ৫৫
ولیس هذه الحال لتقييد المنهى عنه ليكون اصل الربا غير منهى بل لمراعاة الواقع
ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০৬, খ. ৫, পৃ. ৩১১; মুহাম্মদ ইবনু আলী শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, আলেকজান্দ্রিয়া, ১৯৯৪, খ. ১, পৃ. ৬২২

সময় পরিস্থিতির নাজুকতা তুলে ধরার জন্যও বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি কোন বখাটে ছেলেকে ভিখারিনীর থালা ছিনিয়ে নিতে দেখে বলে, "সাবধান, এই অসহায় বৃদ্ধা ভিখারিনীর উপর জুলুম করো না"- তখন তার অর্থ এ নয় যে, সহায় সম্বল সম্পন্ন সচ্ছল পুরুষের উপর জুলুম করা বৈধ; বরং এর উদ্দেশ্য হল জুলুম এমনিতেই গর্হিত কাজ, তবে অসহায় বৃদ্ধা ভিখারিনীর উপর জুলুম আরো জঘন্য ও নিন্দনীয়। অনুরূপভাবে, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এ কথা বুঝানো যে, সুদী কারবার এমনিতেই অপরাধ, আর চক্রবৃদ্ধি সুদ তো আরো জঘন্য; অতএব তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

সায়্যিদ কুতুবের মতে, সুদের 'চক্রবৃদ্ধি' বৈশিষ্ট্যটি শুধু প্রাচীন আরবের সুদী কারবারেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা হল যে কোন সুদী কারবারের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন,

"বস্তুত এ 'চক্রবৃদ্ধি' ক্রিয়া বিশেষণটি নিছক ইতিহাসের বিশেষ এক যুগে আরব উপদ্বীপে প্রচলিত সুদী কারবারের বৈশিষ্ট্য নয়, যাকে নিষিদ্ধ করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়েছে; বরং সুদের হার যা-ই হোক না কেন, চক্রাকারে বৃদ্ধি হল প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেকটি ঘৃণ্য সুদী ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বিশেষত্ব। সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় এ নিয়মকে কেন্দ্র করেই গোটা জাতির সম্পদ আবর্তিত হতে থাকে। অর্থাৎ সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সুদী কারবার কোন ব্যক্তিবিশেষের বিচ্ছিন্ন ও একক কারবার নয়। এটি এক দিক দিয়ে পুণরাবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড। কারণ একজন সুদখোর একটি সুদী কারবার থেকে অর্জিত অর্থকে পুনরায় আরেকটি সুদী কারবারে ব্যবহার করে থাকে, অপর দিক থেকে এটি যৌগিকও বটে অর্থাৎ একজন সুদগ্রহীতা আবার সমাজের আরেক ব্যক্তির সাথে সুদী কারবারে লিপ্ত হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় একটি সুদী কারবারের সাথে গোটা জাতি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। সময়ের আবর্তন, সুদখোরের পুনরায় অর্থলগ্নি ও অসংখ্য লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ফলে প্রত্যেকটি সুদী কারবারই চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুদের এ দিকটি নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই । সুদী ব্যবস্থায় 'চক্রবৃদ্ধি' বৈশিষ্ট্যটি সবসময়ই অটুট থাকে। সুতরাং এটি আরব উপদ্বীপের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত সুদী কারবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সর্বযুগের সুদী ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য"।[১৩]

---

১৩. সায়্যিদ কুতুব, *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন*, আল-কাহেরা : দারুস সুরূক, ২০০৩, খ. ১, পৃ. ৪৭৩
انه فى الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فقط للعمليات الربوية التى كانت واقعة فى الجزيرة و التى قصد اليها النهى هنا بالذات انما هو وصف ملازم للنظام الربوى المقيت ايا كان سعر الفائدة ان النظام الربوى معناه اقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة و معنى هذا ان العمليات الربوية ليست عمليات مفردة و لا بسيطة فهى عمليات متكررة من ناحية و مركبة من ناحية اخرى فهى تنشئ مع الزمن و التكرار و التركيب اضعافا مضاعفة بلا جدال ان النظام الربوى يحقق دائما هذا الوصف فليس هو مقصورا على العمليات التى كانت متبعة فى جزيرة العرب انما هو وصف ملازم للنظام فى كل زمان

চতুর্থ ও সর্বশেষ ধাপ : সকল প্রকার সুদের উপর চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা

সুদসংক্রান্ত সর্বশেষ ধাপের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {٢٧٥} يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {٢٧٦} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {٢٧٧} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {٢٧٨} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {٢٧٩} وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {٢٨٠}

"কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির ন্যায় যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে, 'ব্যবসা তো সুদেরই মতো।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম । কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে। আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দুস্কৃতকারীকে পছন্দ করেন না। অবশ্যই যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান নিঃসন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয়নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। যদি তাওবা করো তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না। তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সাদকা করে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশি ভালো হবে, যদি তোমরা জানতে।"[১৪]

---

১৪. আল কুরআন, ২ : ২৭৫-২৮০

এসব আয়াতে মূলত নিম্নোক্ত বিষয়াবলি আলোচিত হয়েছে :

(ক) সুদের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীদের পরকালীন পরিণতি;

(খ) সকল প্রকার সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ (চাই তা হোক সরল কিংবা চক্রবৃদ্ধি, বাণিজ্যিক কিংবা মৌলিক প্রয়োজন সংক্রান্ত);

(গ) অতীতে কৃত সুদী কারবারসমূহকে রাষ্ট্রীয় আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত (Beyond jurisdiction) ঘোষণা করে সেগুলোকে আল্লাহর নিরঙ্কুশ এখতিয়ারে সোপর্দকরণ;

(ঘ) সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা অর্থনীতির সুস্থ ক্রমবিকাশের অন্তরায়- এ বিষয়ের উপর আলোকপাত;

(ঙ) সুদখোরদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী শক্তির (Coercive power) ব্যবহার;

(চ) গরীব ঋণগ্রহীতাদেরকে ঋণ পরিশোধে বাড়তি সময় প্রদান ও তাতেও ব্যর্থ হলে ঋণ মওকুফে উদ্বুদ্ধকরণ।

সুদের শ্রেণীবিন্যাস ও পরিধি

ইসলামী আইনে রিবা দ্বারা দু' ধরনের রিবাকে বুঝানো হয় :

- রিবা আন-নাসিয়াহ (বিলম্বজনিত সুদ) ও
- রিবা আল-ফাদল (পণ্য বিনিময় সংক্রান্ত সুদ)।

রিবা আন-নাসিয়াহ (বিলম্বজনিত সুদ)

নাসিয়াহ শব্দটি নাসা থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিলম্বিত করা বা স্থগিত রাখা। পারিভাষিক অর্থে রিবা আন-নাসিয়াহ (বিলম্বজনিত সুদ) দ্বারা সেই বাড়তি অংশকে বুঝানো হয় যা ঋণচুক্তির অধীনে সময়ের বিপরীতে ঋণদাতাকে প্রদান করা হয়। পৃথিবী জুড়ে সাধারণত সুদের এ ধারণটিই সর্বাধিক প্রচলিত। আল-কুরআনের সুদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ দ্বারা মূলত এ ধরনের রিবাকেই বুঝানো হয়েছে।

রিবা আন-নাসিয়াহ (বিলম্বজনিত সুদ) নিষিদ্ধ হওয়ার নেপথ্য প্রজ্ঞা

এ ধরনের সুদী কারবার দাতা ও গ্রহীতা- উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে; কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আয় করতে না পারলে এ ধরনের সুদ সুদদাতার অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করে, পক্ষান্তরে সুদগ্রহীতার জন্য তা হয় এক ধরনের 'অনুপার্জিত আয়' (Unearned income)। আর সুদি ঋণের মাধ্যমে সুদদাতা অপ্রত্যাশিত উচ্চমাত্রার মুনাফা অর্জনে সক্ষম হলে সুদগ্রহীতার জন্য তা 'মুনাফার অসম বন্টন' (Unequal distribution of profit) এ পর্যবসিত হয়।[১৫]

---

১৫. http://islam-economy.org/why-interest-is-prohibited-in-islam/

রিবা আল-ফাদল (পণ্য বিনিময় সংক্রান্ত সুদ)

আল-কুরআন রিবা আন-নাসিয়াহ্'র সকল পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, আর নবী করীম স. তাঁর সুন্নাহ্'র মাধ্যমে সেই নিষেধাজ্ঞাকে রিবা আল-ফাদল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। রিবা আল-ফাদল দ্বারা মূলত কী বুঝানো হয় তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আবু সাঈদ রা. এর একটি বর্ণনায়। তিনি বলেন,

"বিলাল রা. কিছু বরনী (উৎকৃষ্ট) খেজুর নিয়ে নবী করীম স. এর নিকটে আসলেন। নবী করীম স. জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কোথাকার খেজুর"? বিলাল রা. জবাব দিলেন, 'আমার কাছে নিম্নমানের কিছু খেজুর ছিল। সেখান থেকে দু' সা' দিয়ে রসূলুল্লাহ্ স. এর খাবারের জন্য এ উৎকৃষ্ট জাতের এক সা' খেজুর কিনে নিয়েছি'। তখন নবী স. বললেন, "ওহে! এতো স্পষ্ট সুদী কারবার। এমনটি করবে না। এরূপ (নিম্নমানের খেজুর দিয়ে উৎকৃষ্ট মানের খেজুর) কিনতে চাইলে প্রথমে (তোমার পণ্যটি) বিক্রি করে দিবে, তারপর (সেই অর্থ দিয়ে) উৎকৃষ্ট মানের খেজুর কিনবে"।[১৬]

রিবা আল-ফাদল এর সর্বব্যাপী সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন তাফসীরবিদ ইবনুল আরাবী। তিনি বলেন, "(কোন ব্যবসায় বা কারবারে) রিবা আল-ফাদল দ্বারা এমন প্রত্যেকটি অতিরিক্ত অংশকে বুঝানো হয় যার কোন বিনিময় (عوض / counter value) প্রদান করা হয় নি"।[১৭]

রিবা আল-ফাদল নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

আল-কুরআন রিবা আল-ফাদল এর উপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করলেও কুরআনের ব্যাখ্যাতা হিসেবে নবী করীম স. এ ধরনের কারবারের উপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল, রিবার পরোক্ষ রাস্তাসমূহ (back doors) আগেভাগেই বন্ধ করে দেয়া। কারণ সমজাতীয় পণ্যের আদানপ্রদানে বেশি নেয়ার সুযোগ রাখা হলে তা ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে বিনা কারণ ও বিনা পরিশ্রমে 'অতিরিক্ত' পাওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করে- যা পরিশেষে সুদী কারবারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এ ব্যাপারে তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তা হলো, "যা

---

১৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ্*, অধ্যায় : আল মুসাক্বাত, অনুচ্ছেদ : বাইউত ত্বআমি মাছালান বিমাছালিন, রিয়াদ : দারু তায়্যিবাহ, ২০০৬, পৃ. ৭৪৮, হাদীস নং-১৫৯৪

جاء بلال بتمر برنى فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم من اين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا ردىء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبى صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله عند ذلك اوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشترى التمر فبعه ببيع اخر ثم اشتر به

১৭. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩, পৃ. ৩২১

كل زيادة لم يقابلها عوض

কিছু অবৈধতার দিকে টেনে নিয়ে যায়- তাও অবৈধ, ঠিক যেমনিভাবে যা সম্পাদনের উপর কোনো ফরযের বাস্তবায়ন নির্ভরশীল- তাও ফরয; যেমন সালাত সম্পাদন ওযুর উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সালাত সম্পাদনের মত ওযু করাও ফরয"।[১৮]

নবী স. এর হুঁশিয়ারী ও উমর রা. এর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

নবী স. মুসলিম জাতিকে এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, সুদ কেবল হাতে গোনা কয়েক ধরনের ব্যবসায় কারবারের মধ্যে সীমিত নয়; বরং সত্তরটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সুদী কারবার সংঘটিত হতে পারে।[১৯] আরবি ভাষায় সত্তর শব্দটি নিছক উনসত্তরের পরের সংখ্যাটি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না; এটি 'অসংখ্য' বা 'অনেক" অর্থও প্রদান করে। এ কারণে নবী স. বলেছেন, "যেসব বিষয় তোমার মনে সংশয় সৃষ্টি করে- তা সেসব বিষয়ের অনুকুলে ছেড়ে দাও যা তোমার মনে সংশয় সৃষ্টি করে না"।[২০]

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন, "কুরআনের (বিধি-বিধান সংক্রান্ত) সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতটি হলো রিবা বিষয়ক। সুদ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করার আগেই আল্লাহ তাঁর রসূলুল্লাহ স. কে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। অতএব রিবা (সুদ) ও রীবাহ (অর্থাৎ কোন বিষয়ের বৈধতার ব্যাপারে সংশয়)- উভয়টিই পরিহার করো"।[২১] সুদ বিষয়ক জ্ঞান ছিল তার নিকট সমগ্র পৃথিবী ও তার সম্পদরাজীর তুলনায় অধিক প্রিয়।[২২] খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছিলেন যাদের দায়িত্ব ছিল বাজার থেকে সেসব লোককে উঠিয়ে দেয়া, যারা রিবা সংক্রান্ত আইন কানুনের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নয়।[২৩]

---

১৮. ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, আল-কাহেরা : মুয়াসসাসাতু কুরতুবা, ২০০০, খ. ২, পৃ. ৪৮৭। ما افضى الى الحرام حرام كما ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

১৯. ইবনে মাজা এর বর্ণনায় তিহাত্তর শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আত তাগলীয ফির রিবা, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ২, পৃ. ৩০৯, হাদীস নং-২২৭৫। الربا ثلاثة و سبعون بابا

২০. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ছিফাতুল ক্বিয়ামাহ ওয়ার রাক্বাইক্ব ওয়াল ওরা, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৪, পৃ. ৩৮২, হাদীস নং-২৫১৮ دع ما يريبك الى ما لا يريبك

২১. ইমাম ইবনে মাজা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২২৭৬
ان اخر ما نزلت اية الربا و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قبض و لم يفسرها لنا فدعوا الربا و الريبة

২২. জারীবাহ ইবনে আহমাদ হারিসী, *ফিক্বহুল ইক্বতিসাদি লি আমীরিল মুমিনীন উমার ইবনিল খাত্তাব*, জেদ্দা : দারুল আন্দালুস আল খাদরা, ২০০৩, পৃ. ৬৩

২৩. আব্দুল হাই কাত্তানী, *নিযামুল হুকুমাতিন নাবাবিয়্যাহ আল-মুছাম্মা আত-তারাতীবুল ইদারিয়্যাহ*, বৈরুত : দারুল আরক্বাম, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১৭

মালিকী ফিকহের বিখ্যাত ইমাম ইবনুল হাজ্জ আল-ফাসী'র *আল-মাদখাল* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দুল হাই কাত্তানী লিখেছেন,
"উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সেসব লোককে চাবুক মেরে উঠিয়ে দিতেন, যারা (সুদ সংক্রান্ত) বিধি-বিধান না শিখেই বাজারে বসে যেত। তিনি বলতেন, 'সুদী কারবার সংক্রান্ত বিধি-বিধান না জেনে আমাদের বাজারে কেউ ব্যবসায় বসতে পারবে না"।[২৪]

রিবা আল-ফাযল এ জড়িয়ে পড়ার ছয়টি পদ্ধতি

নবী স. রিবা আল-ফাযল সংঘটিত হওয়ার ছয়টি কারবারের কথা উল্লেখ করেছেন। এ তালিকা চূড়ান্ত নয়; বরং এসব উদাহরণের মাধ্যমে নবী স. আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কীভাবে একটি কারবারে রিবা ঢুকে পড়ে।[২৫]

১. ছয়টি বিশেষ পণ্য আদান প্রদানে কম-বেশি করা কিংবা কোনো একটি পণ্য পরিশোধে বিলম্ব করা :

আবু সাঈদ আল খুদরী রা. বর্ণিত একটি হাদীসে নবী স. বলেন, **"স্বর্ণ দিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য দিয়ে রৌপ্য, গম দিয়ে গম, যব দিয়ে যব, খেজুর দিয়ে খেজুর ও লবন দিয়ে লবন বিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয় পণ্য সমান সমান ও নগদ হতে হবে। (এরূপ বিনিময়ের ক্ষেত্রে) যে বেশি প্রদান করে অথবা বেশি গ্রহণ করে- সে (এরূপ করার মাধ্যমে) সুদী কারবারে লিপ্ত হয়। দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান (অপরাধী)"**।[২৬]

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে ছয়টি পণ্য (স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর ও লবন) উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এগুলো বিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয় পণ্য সমান সমান ও নগদ হতে হবে। এ নির্দেশ উপরোক্ত ছয়টি পণ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি অপরাপর পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হবে- এ নিয়ে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের আইনবিদগণের মতে, এ নির্দেশটি উপরোক্ত ছয়টি পণ্যের বাইরেও এমন প্রত্যেকটি পণ্যের আন্তঃবিনিময়ে প্রযোজ্য হবে, যেগুলো ওজন (وزن / Weight) কিংবা পরিমাপ (كيل / Measure of capacity) করে বিক্রি করা হয়।[২৭] পক্ষান্তরে শাফিঈ আইনবিদগণ মনে করেন, এ হাদীসের নির্দেশ

---

২৪. আব্দুল হাই কাত্তানী, প্রাগুক্ত
قد كان عمر بن الخطاب يضرب بالدرة من يقعد فى السوق و هو لا يعرف الاحكام و يقول لا يقعد فى سوقنا من لا يعرف الربا

২৫. এম উমার চাপরা, *দ্যা ন্যাচার অব রিবা ইন ইসলাম : দ্যা জার্নাল অব ইসলামিক ইকোনমিকস এন্ড ফাইন্যান্স*, খ. ২, নং ১, জানুয়ারী- জুন ২০০৬, পৃ. ৯-১১

২৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল মুসাক্বাত, অনুচ্ছেদ : বাইউস সারফি ওয়া বাইউয যাহাবি বিল ওয়ারাক্বি নাক্বদান, হাদীস নং-১৫৮৪
الذهب بالذهب و الفضة بالفضة والبر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ و المعطى فيه سواء

২৭. নেইল বি ই বেইলী, *দ্যা মোহামেডান ল অব সেইল এক্কোরডিং টু দ্যা ফাতাওয়া আলমগীরী*, লন্ডন : স্মীথ, এল্ডার এন্ড কো:, ১৮৫০, পৃ. ১৬৪।

এমন প্রত্যেকটি পণ্যের আন্তঃবিনিময়ে প্রযোজ্য হবে, যা বিনিময়ের মাধ্যম (ثمن / Medium of exchange) ও খাদ্যদ্রব্যের (طعام / Eatable things) অন্তর্ভুক্ত।[২৮]

২. পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে বেশি নেয়া- যেখানে একটি পণ্য দেশে প্রচলিত বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of exchange) :

এ নিষেধাজ্ঞার ভিত্তি হলো ফাদালা ইবনে উবাইদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে তিনি বলেন, "খায়বার বিজয়ের দিন আমি ১২ দীনার দিয়ে স্বর্ণ ও মুক্তা সম্বলিত একটি গলার হার ক্রয় করেছিলাম। হার থেকে স্বর্ণ ও মুক্তা আলাদা করে (মেপে) দেখলাম যে, তাতে নিছক স্বর্ণের পরিমাণই ১২ দীনারের বেশি। অতঃপর আমি নবী স. এর নিকট এ ঘটনাটি উল্লেখ করি। তখন নবী স. বললেন, 'অলঙ্কারের উপাদানসমূহ আলাদা করার আগে এ ধরনের অলঙ্কার বিক্রি করা উচিত নয়'।[২৯]

দীনার ছিল স্বর্ণমুদ্রা। তাই দীনারের বিনিময়ে স্বর্ণখচিত অলঙ্কার বিক্রির ক্ষেত্রে নবী স. এ শর্ত প্রদান করেছেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মাধ্যমে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার স্থলে কাগজী মুদ্রাকে সকল রাষ্ট্রের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই টাকার বিনিময়ে এমন কোনো মানিব্যাগ বিক্রি করা যাবে না যার মধ্যে টাকা রয়েছে। একইভাবে পুরাতন টাকার সাথে নতুন নোটের বিনিময়ের ক্ষেত্রেও কম বেশি করা যাবে না। অন্যথায় তা রিবা আল-ফাযলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. গাবনুল মুস্তারসিল - আনাড়ি বিক্রেতাকে ভুল তথ্য দিয়ে কম মূল্যে পণ্য কিনে নেয়া :

কোন আনাড়ি বিক্রেতাকে ভুল তথ্য দিয়ে তার নিকট থেকে কম মূল্যে পণ্য কিনে নেয়ার মাধ্যমে ক্রেতা যেটুকু লাভবান হয়, তা রিবার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সে যেটুকু লাভবান হয়েছে- তা তার অবৈধ লাভ। নবী স. বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে লোক পাঠায়, তার প্রতারণাটি এক প্রকার সুদ"।[৩০]

৪. নাজাশ-নিলামে কৃত্রিম উপায়ে দাম বাড়িয়ে দেয়া

নিলামে সাধারণত সর্বোচ্চ দাম হাঁকিয়ের (Highest bidder) নিকট পণ্য বিক্রি করা হয়। অনেক সময় নিলাম বিক্রেতা তার গোপন প্রতিনিধির (secret agents) মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে বেশি দাম হাঁকতে থাকে, যাতে নিলামে অংশগ্রহণকারী

---

২৮. ড. ওয়াহবাহ আল-যুহাইলী, *আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৮৫, খ. ৪, পৃ. ৪৯৫।

২৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল মুসাক্বাত, অনুচ্ছেদ : বাইউল ক্বিলাদাহ ফীহা খারাজ ওয়া যাহাব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৫৯১।

اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب و خرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثنى عشر دينارا فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع حتى تفصل

৩০. আলী মুত্তাকী হিন্দী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল*, বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬, খ. ৪, পৃ. ৬২, হাদীস নং-৯৫২১।

من استرسل الى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك رباء

ক্রেতারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আরো বেশি দামে কিনতে রাজি হয়। এ প্রক্রিয়ায় বেশি দামে বিক্রি করার মাধ্যমে যে বাড়তি লাভটুকু করা হল- তা সুদ। নবী স. বলেন, "যে ব্যক্তি নিলামে কৃত্রিমভাবে দাম হাঁকে, সে একজন অভিশপ্ত সুদখোর"।[৩১]

৫. কোন ব্যক্তির অনুকূলে সুপারিশ করে তার নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ করা

নবী স. বলেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুকূলে সুপারিশ করে তার নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ করে, সে একটি বৃহৎ দরজা দিয়ে সুদী কারবারের রাজ্যে প্রবেশ করে'।[৩২] সুপারিশের উপর কোনো বিনিময় নেয়ার এ নিষেধাজ্ঞাটি মূলত এমন সুপারিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে সুপারিশকর্তা আইনগতভাবে অনুরূপ সুপারিশ করতে বাধ্য, যেমন কোন মজলুম ব্যক্তিকে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সুপারিশ। এরূপ ক্ষেত্রে সুপারিশ করার মাধ্যমে সে নিছক তার দায়িত্ব পালন করে- যার জন্য সে কোনো পারিতোষিক পাওয়ার উপযুক্ত নয়।[৩৩]

৬. কোনো পণ্য দখলে নেয়ার আগেই বিক্রি করে দেয়া

উমাইয়া খলীফা মারওয়ানের শাসনামলে লোকদেরকে খাদ্যদ্রব্য দখলে নেয়ার আগেই বিক্রি করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এ অবস্থা দেখে আবু হুরায়রা রা. মারওয়ানকে বললেন, "আপনি তো (এরূপ করার অনুমতি দিয়ে) সুদি কারবারকে বৈধতা দিয়ে দিয়েছেন। পরে মারওয়ান লোকদেরকে খাদ্যদ্রব্য দখলে নেয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেন"।[৩৪]

সুদের ধরন নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত

ভারতীয় উপমহাদেশের বিপুল সংখ্যক লোক অমুসলিম হলেও মুসলিমরা দীর্ঘ ছয়শো বছরেরও বেশি সময় (১২০৪-১৮৫৭) ধরে এ এলাকা শাসন করে। এ সুদীর্ঘ সময়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় আইন সংকলন (Code) ছিল মূলত দু'টি : আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়্যাহ ও আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ। দ্বিতীয় গ্রন্থটি ছিল সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর কর্তৃক নিযুক্ত চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি ল' কমিশনের বহু

---

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫, হাদীস নং-৯৫৮৮। الناجش اكل ربا ملعون

৩২. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৩, পৃ. ১৪৫, হাদীস নং-৭৯০।
من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا

৩৩. সালিহ উছাইমিন, *ফাতহু যিল জালালি ওয়াল ইকরাম বি শাহরি বুলূগিল মারাম*, আল-কাহেরা : আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ২০০৬, খ. ৪, পৃ. ৩৯-৪১।

৩৪. মুহীউদ্দীন নববী, *সহীহ মুসলিম বি শারহিন নববী*, আল-কাহেরা : মুয়াসসাসাতু কুরতুবাহ, ১৯৯৪, খ. ১০, পৃ. ২৪২-২৪৩, হাদীস নং-১৫২৮।
عن ابى هريرة انه قال لمروان احللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال ابو هريرة احللت بيع الصكاك و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها

দিনের চেষ্টার ফসল। ভারতে মুসলিম শাসনের দীর্ঘ সময় জুড়ে উক্ত দু'টি সংকলন ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য আইনবলে সুদি কারবারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ছদ্মবেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এখানকার স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এর ফলে মুসলিমদের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলো একের পর এক হাতছাড়া হতে থাকে। অবশেষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে নৃশংসভাবে দমন করার মধ্য দিয়ে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

ম্যাকলের (T B Macaulay) নেতৃত্বাধীন প্রথম আইন কমিশন কর্তৃক ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত আইন প্রণয়নের (secular legislation) কাজ ১৮৩৫ সাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের পাশাপাশি এসব নতুন আইন-কানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সুদী কারবারের বৈধতা প্রদান করা হয়। দীনি অনুভূতিসম্পন্ন মুসলিমরা প্রথম দিকে এ সুদীব্যবস্থা থেকে গা বাঁচিয়ে চলেন। সুদী কারবারের বৈধতা দেয়ার ফলে দরিদ্র লোকেরা দিনে দিনে অধিকতর দরিদ্র হতে থাকলেও গুটিকতেক লোক সুদী কারবারে অর্থলগ্নি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ-বিত্ত লাভ করতে থাকে। আর এ অতিরিক্ত অর্থ সম্পদের বদৌলতে নব্য সুদখোররা তৎকালীন সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় ক্রমশ শোচনীয় হতে থাকে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের এ দুরবস্থার জন্য ইসলামী আইন থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকে দায়ী না করে কতিপয় 'মুসলিম' উল্টো ইসলামী আইনকেই দায়ী করতে থাকে। আবার কেউ কেউ ইসলামের অর্থনৈতিক আইনের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। এই নব্য ব্যাখ্যাতাদের মতে, ইংরেজ সরকার বাহাদুর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে সুদী ব্যবস্থা চালু করেছে- তা আদতে ইসলামে নিষিদ্ধ রিবার মধ্যেই পড়ে না। কারণ (তাদের মতে) কুরআনে কেবল 'চক্রবৃদ্ধি সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে ইংরেজ সরকারের আইনে হালালকৃত সুদ 'চক্রবৃদ্ধি' নয়; আর দ্বিতীয়ত, ইসলাম নিছক মহাজনী সুদকে নিষিদ্ধ করেছে, বাণিজ্যিক ঋণের উপর আরোপিত সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তাদের চক্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত যুক্তির ভ্রান্তি ও অসারতা 'চক্রবৃদ্ধি সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা' শিরোনামে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্পর্কে নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো :

মহাজনী সুদ ও বাণিজ্যিক সুদ : ইসলামে কোনটি নিষিদ্ধ?

ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুদকে নিষিদ্ধ করেছে; তাতে মহাজনী সুদ ও বাণিজ্যিক সুদের মধ্যে কোনো বিভাজন রেখা টানা হয় নি। তা সত্ত্বেও নব্য ব্যাখ্যাতাদের দাবি, ইসলাম নিছক মহাজনী সুদ (Usury) কে নিষিদ্ধ করেছে, বাণিজ্যিক ঋণের সুদ (Interest on commercial loan) কে নয়। তাদের এ দাবির পেছনে কোনো

ইতিবাচক প্রমাণ নেই, বরং এর পেছনে নিছক এ ধারণাই কার্যকর যে, আগেকার যুগে লোকজন নিছক ব্যক্তিগত মৌলিক প্রয়োজনে পূরণ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করতো, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ঋণ নেয়ার প্রথা মাত্র কয়েক শ' বছর আগে চালু হয়েছে। প্রাচীন আইন গবেষক ড্রাইভার (Driver) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ডব্লিউ ডেভিস (W W Davies) লিখেছেন,

"কোন কিছু ধার দিয়ে তার উপর সুদ আরোপ করার ব্যাপারে ইহুদীদের আইনে যে নিন্দাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে তার সাথে গ্রীস ও রোম এমনকি প্রথম দিকের খ্রিষ্টীয় চার্চের চিন্তাবিদদের মতের যথার্থ মিল রয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো এই যে, প্রাচীন কালে নিছক কোনো ব্যবসায় কিংবা বাণিজ্যিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করার নজির ছিল অত্যন্ত বিরল। (সেহেতু) প্রাচীনকালের মানবহিতৈষী ঋণ ও বর্তমান যুগের বাণিজ্যিক ঋণের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা টানা উচিত"।[৩৫]

ডেভিসের উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যাসত্য বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এটুকু উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন, যে ইহুদী জাতির আইনকে জড়িয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে-সেই ইহুদী পণ্ডিতবর্গই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা সাধারণ সুদ (Interest) ও মহাজনী সুদ (Usury) এর মধ্যে কোনো পার্থক্যরেখা টানেন নি। ইহুদীদের জাতীয় জ্ঞানকোষ *The Jewish Encyclopedia* তে বলা হয়েছে,

"বর্তমান যুগের পরিভাষায়, 'মহাজনী সুদ (Usury) বলতে আইন বা জনমত দ্বারা নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি সুদ নেয়াকে বুঝায়; তবে তাওরাতে ইহুদীদের মধ্যকার ঋণ কার্যক্রমে সময় অতিক্রমণ কিংবা (লগ্নিকৃত অর্থ নিজে ব্যবহার থেকে) বিরত থাকার অজুহাতে সকল প্রকার "বাড়তি" আদান-প্রদানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে- চাই সুদের হার চড়া হোক, কিংবা কম; তবে ইহুদী ও অইহুদীদের মধ্যকার কারবারে কোনো সীমা আরোপ করা হয়নি। সুতরাং ইহুদী আইন আলোচনার সময় "সুদ (Interest)" ও "মহাজনী সুদ (Usury)" পরিভাষা দুটির প্রত্যেকটিকে অপরটির স্থলে নির্বিচারে ব্যবহার করা যায়"।[৩৬]

---

৩৫. ডব্লিউ ডব্লিউ ডেভিস, *দ্যা কোডস অব হাম্মুরাবী এন্ড মোজেজ উইথ কৌপিয়াস কমেন্ট, ইন্ডেক্স এন্ড বাইবেল রেফারেন্সেস*, নিউ ইয়র্ক : ইটন এন্ড মেইন্স, ১৯০৫, পৃ. ৪৪

"Hebrew legislation, in condemning interest on anything lent, agrees perfectly with the thinkers of Greece and Rome, as well as those of the early Christian Church. The fact, however, is, that it was very uncommon in ancient times to borrwo money simply for the sake of speculatin, or mere investment in some business project. A clear-cut distinction should be made between the ancient charitable loan and the modern commercial loan."

৩৬. ড. সাইরাস এডলার ও অন্যান্য সম্পাদিত, *দ্যা জুইশ এনসাইক্লোপিডিয়া*, নিউ ইয়র্ক, ফাঙ্ক এন্ড ওয়াগনালস কো., ১৯০৫, খ. ১২, পৃ. ৩৮৮

এবার প্রাচীন সভ্যতাসমূহ (বিশেষত ব্যাবিলন, আসিরীয়া, গ্রীস, রোম) এর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। তাদের মধ্যে নিছক মহাজনী সুদ চালু ছিল, নাকি বাণিজ্যিক ঋণের উপরও সুদ ধার্য করা হতো।

ব্যাবিলন : ব্যাবিলনীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহের অন্যতম। এটি ছিল বাণিজ্যনির্ভর একটি সভ্যতা- সুদী ব্যবস্থা ছিল যার চালিকাশক্তি। অতি সম্প্রতি যেসব শিলা-লিপি আবিস্কৃত হয়েছে তা থেকেও এ সভ্যতার অসাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রকৃতি উন্মোচিত হয়।[৩৭] এতে বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহেও অর্থলগ্নি করা হতো। সভ্যতার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ উইল ডুরান্ট (Will Durant) এর ভাষায়,

"পণ্যসামগ্রী বা মুদ্রার মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হতো, তবে তাতে সুদের হার ছিল চড়া- যা রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দিতো.... কোন (আনুষ্ঠানিক) ব্যাংক ছিল না, তবে কতিপয় প্রভাবশালী পরিবার বংশানুক্রমে অর্থ লগ্নি করার ব্যবসায় চালিয়ে যেতো; তারা স্থাবর সম্পত্তির ব্যবসায় করার পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহেও অর্থায়ন করতো"।[৩৮]

আসিরীয়া : তারপর আসে আসিরীয় সভ্যতার কথা। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ব্যাবিলনীয়দের থেকে ভিন্ন কিছু ছিলো না। এ সভ্যতাতেও "শিল্প ও বাণিজ্যে অর্থ যোগান দিতো কিছু বেসরকারী ব্যাংক- যারা ঋণের উপর শতকরা ২৫ ভাগ সুদ আরোপ করতো"।[৩৯] সুতরাং আসিরীয়দের মধ্যেও সুদের প্রচলন নিছক মৌলিক প্রয়োজন পূরণ সংক্রান্ত ঋণের মধ্যে সীমিত ছিলো না, তারা যথারীতি বাণিজ্যিক প্রয়োজনেও ঋণ গ্রহণ করতো এং তার উপর সুদ আরোপ করা হতো।

"In modern language this term (usury) denotes a rate of interest greater than that which the law or public opinion permits; but the Biblical law, in all dealings among Israelites, forbids all "increase": of the debt by reason of lapse of time or forbearance, be the rate of interest high or low, while it does not impose any limit in dealings between Israelites and Gentiles. Hence in discussing Jewish law the words "interest" and "kusury" may be used inddiscriminately."

৩৭. উইল ডুরান্ট, *স্টোরী অব সিভিলাইজেশান*, নিউ ইউর্ক : সাইমন এন্ড সাস্টের, ১৯৪২, খ. ১, পৃ. ২২৯

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

"Loans were made in goods or currency, but a high rate of interest, fixed by the state ... There were no banks, but certain powerful families carried on from generation to generation the business of lending money; they dealt also in real estate, and financed industrial enterprises"

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

"Industry and trade were financed in part by private bankers, who charged 25% for loans"

গ্রীস : প্রাচীন গ্রীসের ঋণ কার্যক্রমের একটি বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে উইল ডুরান্টের নিম্নোক্ত বর্ণনায় :

"...কেউ কেউ মন্দিরের ভাণ্ডারে নিজেদের অর্থ জমা রাখতো। মন্দিরগুলো ব্যাংক এর দায়িত্ব আঞ্জাম দিতো এবং ব্যক্তিবিশেষ ও রাষ্ট্রকে পরিমিত সুদে ঋণ প্রদান করতো; কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেলফির এপোলো মন্দিরটি ছিল সমগ্র গ্রীসের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক...পঞ্চম শতকে এসে পোদ্দাররাও অর্থ জমা নিতে শুরু করে। তারা এ অর্থ ব্যবসায়ীদেরকে সুদী ঋণ আকারে প্রদান করতো- ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী সুদের হার ১২ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হতো; এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একেকজন পোদ্দার একেক ব্যাংকারে পরিণত হয়... তারা এ পদ্ধতি নিকট প্রাচ্য থেকে গ্রহণ করে তার সমৃদ্ধি সাধন করে এবং তা রোমানদের নিকট পৌঁছে দেয়, আর আধুনিক ইউরোপ এ পদ্ধতিটি লাভ করে রোমানদের থেকে...শতাব্দীর শেষের দিকে এন্টিস্থেনস ও আর্কেস্ট্রেটাস বেসরকারী পর্যায়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে...তাদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার ফলে এথেন্সের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে"।[৪০]

উপরের রেখাচিহ্নিত অংশগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রথমত, সুদী ঋণ কেবল অভাবী ও দরিদ্র মানুষকে দেয়া হতো না, তারা যথারীতি রাষ্ট্রকেও সুদী ঋণ প্রদান করতো। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীদেরকে তাদের ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সুদী ঋণ প্রদান করা হতো এবং ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করা হতো। তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ আধুনিক ইউরোপের উদ্ভাবন নয়; বরং তা হলো প্রাচীন যুগের লোকদের থেকে ইউরোপের ধার করা এক পদ্ধতি। চতুর্থত, তৎকালীন লোকজন কেবল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান সমস্যা দূরীকরণের নিমিত্তেই সুদী ঋণ গ্রহণ করতো না, বরং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের লক্ষ্যেও ব্যাংকগুলো থেকে সুদে ঋণ নেয়া হতো।

---

৪০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৪

• "... some deposit their money in temple treasuries. The temples serve as banks, and lend to individuals and states at a moderate interest; the Temple of Apollo at Delphi is in some measure an international bank for all Greece.... Meanwhile the money changer at his table begins in the fifth century to receive money on deposit, and to lend it to merchants at interest rates that vary from 12 to 30 percent according to the risk; in this way he becomes a banker.... He takes his methods from the Near East, improves them, and passes them on to Rome, which hands them down to modern Europe. ...Towards the end of the century Antisthenes and Archestratus establish what will become ... the most famous of all private Greek banks ... the facilities that they offer stimulate creatively the expansion of Athenian trade."

রোমান সাম্রাজ্যের প্রাথমিক অবস্থা

গ্রীকদের পর সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে রোমানদের। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা মূলত গ্রীক ও রোমান সভ্যতারই সন্তান। গ্রীকদের দার্শনিক চিন্তা ও রোমানদের আইন চিন্তা ইউরোপিয়ানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের সুবাদে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গ্রীক দর্শন ও রোমান আইন ছড়িয়ে পড়েছে। এবার দেখা যাক গ্রীকদের পর রোমানদের বাণিজ্যিক জীবনে সুদের কতটুকু প্রভাব পড়েছিল।

"পরিশেষে সর্বত্রই ব্যাংকারদের উপস্থিতি নজরে পড়তে থাকে। তারা পোদ্দারের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি... ব্যক্তি ও অংশীদারী কারবারকে ঋণ সরবরাহ করতো। রোমে এ ব্যাংকিং পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে গ্রীস ও পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীক রাজ্যসমূহ থেকে... অগাস্টাস সিজারের শাসনামলে যেখানে সুদের হার ছিল শতকরা চার ভাগে, তার মৃত্যুর পর এ হার দাড়ায় শতকরা ছয় ভাগ এবং কন্সট্যান্টাইনের শাসনামলে এসে তা শতকরা বারো ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যায়- যা ছিল তৎকালীন আইনে সর্বোচ্চ হার"।[৪১]

কুরআন নাযিলের প্রাক্কালে রোমান সাম্রাজ্যে সুদী ঋণের অবস্থা

হেজায অঞ্চলে বিদেশী প্রভুত্ব কায়েম না হলেও ষষ্ঠ শতকের মধ্যে আরবের উত্তরাঞ্চল (বর্তমান উত্তর সৌদী আরব, জর্ডান, ফিলিস্তিন, ইসরাইল, লেবানন ও সিরিয়া) ও দক্ষিণ আরব (বর্তমান ইয়েমেন ও দক্ষিণ সৌদী আরব)- এ রোমান শাসন যথেষ্ট পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যু হয় ৫৬৫ সালে অর্থাৎ, নবী স. এর জন্মগ্রহণের মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে। জাস্টিনিয়ানের শাসনামলে কোনো ঋণের উপর কী পরিমাণ সুদ ধার্য করা হয়েছিল তার একটি বর্ণনা পাওয়া যাবে উইল ডুরান্টের নিম্নোক্ত বক্তব্যে :

"ততোদিনে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। জাস্টিনিয়ান ক্ষমতাসীন হয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির ঋণের উপর সুদের যে সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন- তা থেকে আমরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অগ্রগতির বিচার করতে পারি। তিনি কৃষি ঋণের উপর শতকরা চার ভাগ, জামানতের বিপরীতে সাধারণ লোকদেরকে দেয়া

---

৪১. প্রাগুক্ত, ১৯৪৪, খ. ৩, পৃ. ৩৩১

"Consequently bankers were everywhere. They served as money-changers ... lent money to individuals and partnerships. This banking system had come from Greece and the Greek East. ... Interest rates, which had sunk to four percent under the weight of Augustus' Egyptian spoils, rose to six percent after his death, and reached their legal maximum of twelve percent by the age of Constantine."

ঋণের উপর শতকরা ছয় ভাগ, বাণিজ্যিক ঋণের উপর শতকরা আট ভাগ ও সামুদ্রিক বিনিয়োগে ঋণ প্রদানের উপর বার ভাগ সুদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।"[৪২]

সপ্তম শতকে আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা

মক্কা এক ঊষর ভূ-খণ্ড যার চারপাশে কেবল মরুভূমির পোড়া বালি। মক্কার লোকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট খাবার মক্কাতে উৎপাদিত হতো না। যার ফলে তাদেরকে তীর্থযাত্রীদের উপর আরোপিত কর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতে হতো। এর সুবাদে মক্কার লোকজন ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠী হিসেবে সমগ্র আরব ও তার আশেপাশের এলাকায় পরিচিতি লাভ করে। "সেই সময়ে মক্কা ব্যাংকিং কার্যের কেন্দ্র হয়ে পড়েছিল। সেখানে দূরবর্তী দেশের জন্য অর্থ আদান প্রদান করা হতো। বলতে গেলে মক্কা আন্তর্জাতিক ব্যবসার বাজার হয়ে পড়েছিল।"[৪৩] মক্কার বণিকশ্রেণী প্রায়শ তাদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়া ও ইস্তাম্বুলে পাড়ি জমাতো। এ ধরনের আন্তর্জাতিক বণিক শ্রেণীর পক্ষে যেমন আশেপাশের লোকদের বাণিজ্যিক ঋণের সুদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনিভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত পুঁজি দিয়ে এতো বৃহৎ পরিসরে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিচালনা করাও ছিল অত্যন্ত দুরূহ। সঙ্গত কারণে তাদেরকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনেও ঋণ গ্রহণ করতে হতো। আর এরই পরিপেক্ষিতে সব ধরনের সুদী কারবারের উপর ইসলামের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।

ব্যাংকের সুদ কি রিবা'র অন্তর্ভুক্ত ?

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনরূপ শ্রেণীবিন্যাস না করে ইসলাম সব ধরনের সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতক থেকে সুদভিত্তিক ইউরোপীয় অর্থব্যবস্থা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে ইসলামে সুদের পরিধি নিয়ে প্রথমবারের ন্যায় বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ২০০২ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর সাইয়েদ তানতাভীর একটি ফাতওয়া সুদ সম্পর্কিত চলমান বিতর্কে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। ইন্টারন্যাশনাল আরব ব্যাংকিং কর্পোরেশন এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর চেয়ারম্যান ড. হাসান আব্বাস যাকী উক্ত ফাতওয়ায় জানতে চান, লাভের হার আগে থেকে নির্ধারণ করে কোন ব্যাংক বা আর্থিক

---

৪২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২০

"Banking was now highly developed. We may judge the prosperity of the Byzantine Empire at Justinian (d. 565)'s accession by his fixing of the maximum interest rate at four percent on loans to peasants, six percent on private loans secured by collateral, eight percent on commercial loans, and twelve percent on maritime investments".

৪৩. ও' লিয়েরী, *এরাবিয়া বিফোর মুহাম্মদ*, লন্ডন : কেগান পল, ১৯২৭, পৃ. ১৮২

"Mecca had become a banking centre where payments could be made to many distant lands, and a clearing house of international commerce".

প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা রাখা বৈধ কি না।[৪৬] জবাবে তানতাভী বলেন, "বিনিয়োগ প্রতিনিধি হিসেবে কোন ব্যাংক কিংবা তদনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে আগাম মুনাফা নির্ধারণ করে মূলধন বিনিয়োগ করা সন্দেহাতীতভাবে বৈধ"।[৪৭] এ মতের স্বপক্ষে তিনি দু'টি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত, গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকে টাকা জমা রাখা কোন ঋণচুক্তি নয়, বরং তা হল ব্যাংকের ব্যবসায় কার্যক্রমে এজেন্সির মাধ্যমে বিনিয়োগ (وكالة استثمارية / Investment Agency)। অর্থাৎ এ বিনিয়োগ চুক্তিতে অর্থ জমাদানকারী (Depositor) হলেন প্রধান ব্যক্তি (موكل / Principal), আর ব্যাংক হল তার প্রতিনিধি (وكيل / Agent)। অতএব, কাউকে ঋণ দিয়ে বাড়তি কিছু নেয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা এরূপ বিনিয়োগ এজেন্সির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়ত, কোন বিনিয়োগ চুক্তিতে এক পক্ষের লাভ আগে থেকে সুনির্দিষ্ট করার উপর কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি।[৪৮]

প্রথম যুক্তির ভ্রান্তি একেবারে সুস্পষ্ট, কারণ গ্রাহকের সাথে গতানুগতিক ব্যাংকের চুক্তিকে এজেন্সির সাথে তুলনা করার কোন অবকাশই নেই। প্রথমত, এজেন্সি চুক্তিতে লাভ-লোকসান পুরোটাই প্রধান ব্যক্তির; এজেন্ট নিছক পারিশ্রমিক লাভের উপযুক্ত। অথচ গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ খাটিয়ে যে পরিমাণ লাভ হয়, তা থেকে একটি সুনির্দিষ্ট অংশ গ্রাহককে প্রদান করে বাকি সবটুকুই ব্যাংক গলধকরণ করে নেয়। দ্বিতীয়ত, এজেন্সি চুক্তিতে এজেন্ট প্রধান ব্যক্তিকে কোন নিশ্চয়তা (ضمانة / Guarantee) প্রদান

---

৪৪. 'আগাম মুনাফা নির্ধারণ করে দেয় এমন ব্যাংকে অর্থ বিনিয়োগ' শিরোনামে প্রশ্নটি ছিল এরূপ: "ইন্টারন্যাশনাল আরব ব্যাংকিং কর্পোরেশন এর গ্রাহকবৃন্দ পূর্ব নির্ধারিত মুনাফা বন্টনের (প্রতিশ্রুতির) বিনিময়ে নিজেদের তহবিল ও সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখে, যা বৈধ খাতে ব্যবহার ও বিনিয়োগ করা হয়; এতে মুনাফা বন্টনের সময়কালের ব্যাপারেও গ্রাহকদের সাথে আগাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। আমরা আপনার নিকট থেকে এ ধরনের চুক্তির আইনগত মর্যাদা জানতে চাই"।

فان عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدمون اموالهم و مدخراتهم للبنك الذى يستخدمها و يستثمرها فى معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم و يحدد مقدما فى مدد يتفق مع العميل عليها و نرجو الافادة عن الحكم الشرعى لهذه المعاملة

প্রশ্নটির স্ক্যান কপির জন্য দেখুন : মাহমুদ এ আল জামাল, *ইন্টারেস্ট এন্ড দ্যা প্যারাডক্স অব কন্টেম্পোরারী ইসলামিক ল' এন্ড ফাইন্যান্স, ফার্ডহ্যাম ইন্টারন্যাশনাল ল' জার্নাল*, ভলিউম ২৭, ইস্যু ১, ২০০৩, পৃ. ১৩৭

৪৫. মাহমুদ এ আল জামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

ان تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون اموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية فى البنوك او غيرها حلال و لا شبهة فى هذه المعاملة

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯.

لانه لم يرد نص فى كتاب الله او من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التى يتم فيها تحديد الربح او العائد مقدما

করে না; পক্ষান্তরে গতানুগতিক ব্যাংক তার গ্রাহককে জমাকৃত অর্থ সুদসহ ফিরিয়ে দেয়ার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করে - যার ফলে চুক্তিটি অনিবার্যরূপে ঋণচুক্তিতে পরিণত হয়। আর ঋণচুক্তির অধীনে শর্তাকারে বাড়তি কোনকিছু গ্রহণ করা বৈধ নয়।

কোন বিনিয়োগ চুক্তিতে এক পক্ষের লাভ আগে থেকে সুনির্দিষ্ট করার উপর কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে কি না - তা পর্যালোচনা করার পূর্বে মনে রাখা প্রয়োজন, গ্রাহকের সাথে গতানুগতিক ব্যাংকের চুক্তি মূলত কোন বিনিয়োগ চুক্তিই নয়। তা সত্ত্বেও যদি কোন গ্রাহক ব্যাংকের সাথে প্রকৃত অর্থেই বিনিয়োগ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে ঠিক তখনই তার জন্য লাভে ভাগ বসানো বৈধ হবে-যখন সে লোকসানেও অংশ নিতে সম্মত থাকবে। অথচ গতানুগতিক ব্যাংকব্যবস্থায় গ্রাহককে কোন লোকসানে অংশগ্রহণ করতে হয় না।

নবী স. স্পষ্টভাবে বলেছেন, "লাভ কেবল তারই অধিকার যে দায় নিতে প্রস্তুত"।[৪৯] উক্ত হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী যেখানে বিনিয়োগের নাম নেয়া মাত্র স্বয়ং মূলধনকেও নিরাপদ রাখার কোন সুযোগ নেই, সেখানে আগে থেকেই মূলধনের উপর লাভ নির্ধারণ করে রাখার অবৈধতার জন্য বাড়তি প্রমাণ অনুসন্ধান নিরর্থক। আর এরই ভিত্তিতে ইসলামী আইনবিদগণ একমত হয়েছেন যে, "কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ আগাম লাভ নির্ধারণ করে রাখলে নিষ্ক্রিয় অংশীদারী কারবার (مضاربة / Silent partnership) বাতিল হয়ে যায়"।[৫০]

সুতরাং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী ও বেসরকারী যে কোন প্রকল্পে আগাম লাভ নির্ধারণ পূর্বক অর্থ জমা রাখা সন্দেহাতীতভাবে কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা কার্যক্রমেরই অংশ। একইভাবে সেসব প্রতিষ্ঠান যে গতানুগতিক পন্থায় গৃহ নির্মাণ, ফ্ল্যাট বা গাড়ি ক্রয় কিংবা মৌলিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য আগাম লাভ নির্ধারণ পূর্বক ঋণ প্রদান করে থাকে- তাও নিষিদ্ধ রিবার অন্তর্ভুক্ত।

---

৪৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ফী মান ইসতারা আব্দান ফাস্তা'মালাহু ছুম্মা ওয়াজাদা বিহী আইবান, আল কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৯, খ. ৩, পৃ. ১৫২০, হাদীস নং-৩৫০৮। الخراج بالضمان

৪৮. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ২০০৭, খ. ৭, পৃ. ১৪৫-১৪৬
و جملته انه متى جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومة او جعل مع نصيبه دراهم مثل ان يشترط لنفسه جزئا و عشرة دراهم بطلت الشركة قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القراض اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة و ممن حفظنا ذلك عنه مالك و الاوزاعى و الشافعى و ابو ثور و اصحاب الراى

উপসংহার

সুদ একটি সামাজিক ব্যাধি। সুদী মানসিকতা ও মানবিকতা পরস্পর বিরোধী; একটির উপস্থিতি অপরটির মৃত্যু ডেকে আনে। কোন সমাজে সুদী ব্যবস্থাকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হলে মানুষ হয়ে ওঠে মাত্রাতিরিক্ত লোভী ও স্বার্থপর; ধনী-গরীবের বৈষম্য লাভ করে এক স্থায়ী রূপ। এসব বিষয় সামনে রেখে আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. সুদের উপর নিরঙ্কুশ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, এমনকি এ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন সুস্পষ্ট যুদ্ধ। যদিও ঋণের উপর আরোপিত সুদ (রিবা আন-নাসিয়াহ) কে নিষিদ্ধ করাই ছিল কুরআনের আসল উদ্দেশ্য, তদুপরি নবী স. রিবা আল-ফাযলের আওতায় সেসব কারবারকেও অবৈধ ঘোষণা করেছেন, যা পরোক্ষভাবে সুদের রাস্তা খুলে দেয়। রিবা সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ক্রমধারা, নবী স.-এর ব্যাখ্যা, উমর রা.-এর সতর্কতামূলক পদক্ষেপ ও বিভিন্ন সভ্যতার ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পর বাণিজ্যিক সুদ ও মহাজনী সুদ কিংবা সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ-ইত্যাকার ভাগে বিভক্ত করে কোনো এক বিশেষ প্রকার সুদকে বৈধতা দেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৬
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৩

ইসলামে সফরের বিধান ও মুসাফিরের সামাজিক নিরাপত্তা

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ*

[**সারসংক্ষেপ :** *সামাজিক নিরাপত্তা বর্তমান সময়ের অতিপরিচিত একটি বিষয়। সমাজে বসবাসকারী জনসাধারণের আপদকালীন সময়ে বা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে তারা যখন চরম আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখন তাদেরকে সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে আর্থিক সাহায্য বা ভাতা দেয়া হয় তাকে আধুনিক কালে সামাজিক নিরাপত্তা বলে। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশে বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে অসংখ্য লোক এ সুবিধা পেয়ে থাকে। ইসলাম মানব সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে। বিশেষ করে যারা আকস্মিক সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। এদের মধ্যে একটি শ্রেণী হল ইবনুস-সাবীল বা মুসাফির। আলোচ্য প্রবন্ধে মুসাফিরের সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে ইসলামের গৃহীত ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হবে।*]

ইব্‌নুস-সাবীল এর পরিচয়

ইসলামে 'ইব্‌নুস-সাবীল' বলে বোঝানো হয় সে পথিক বা মুসাফিরকে, যে এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়। এটি একটি আরবী পরিভাষা। আরবীতে 'ইব্‌ন' অর্থ ছেলে আর 'সাবীল' অর্থ পথ। একত্রে 'ইব্‌নুস সাবীল' অর্থ দাড়ায়: পথের ছেলে, পথিক বা মুসাফির। মুসাফিরকে 'ইব্‌নুস-সাবীল' বলা হয় এজন্য যে, মুসাফির বা পথিকের জন্যে পথই হয় অবিচ্ছিন্ন সাথী। الرائد (*আর-রা'য়িদ*) নামক আধুনিক আরবী অভিধানে إبن السبيل ('ইবনুস-সাবীল') অর্থ লিখা হয়েছে: المسافر (মুসাফির)।[১] বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইব্‌ন নুজাইম (মৃ. ৯৭০ হি.) '*আল-বাহরুর রা'য়িক*' গ্রন্থে বলেন: " 'ইব্‌নুস-সাবীল' ঐ ব্যক্তিকে বল হয়, যে স্বীয় সম্পদ থেকে দূরত্বের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সাবীল অর্থ রাস্তা, যে ব্যক্তিই রাস্তায় সফর করে তাকেই 'ইব্‌নুস-সাবীল' বলা হয়।"[২]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. জাবরান মাস'উদ, *আর-রা'য়িদ*, বৈরূত : দারুল 'ইলম লিলমাল্লাইন, ১৯৯২, পৃ. ১৫

২. শায়খ যায়নুদ্দীন ইব্‌ন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক*, মক্কা : দারুল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, ১২৫২ হিজরী, খ. ২, পৃ. ২৪২

ابن السبيل هو المنقطع عن ماله لبعده عنه والسبيل الطريق فكل من يكون مسافرا يسمي ابن السبيل

সাইয়িদ মুহাম্মদ রশীদ রিযা বলেন : 'ইব্নুস-সাবীল' এমন লোককে বলা হয় যিনি সফরে গিয়ে পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি পরিবার এবং নিকটাত্মীয় কারো সাথে মিলিত হতে পারছেন না। সফর অবস্থায় তার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন, তাকে সাহায্য করার আদেশ দানের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত মুসলিমদেরকে জমিনে ভ্রমণ ও পর্যটনে উৎসাহিত করেছে।[৩]

জমিনে ভ্রমণ ও পর্যটন

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনুল কারীমে ভ্রমণ ও পর্যটনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন : "বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর।" (৬ : ১১) এই আয়াত সাধারণভাবে প্রমাণ করে যে, সফর ও ভ্রমণ করা আবশ্যক। তবে আল্লামা যামাখশারী ও আল্লামা বায়যাভীর রহ.-এর মতে, এ আয়াতের নির্দেশ হল মুবাহ বা বৈধতা বুঝানোর জন্য। কুরআন মাজীদে জমিনে ভ্রমণের নির্দেশটি বহুবার এসেছে। এগুলোর মধ্যে কতগুলো আয়াতে মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন: সূরা আন'আম (৬ : ১১), ইউসুফ (১২ : ১০৯) আন-নাহল (১৬ : ৩৬), আন-নামল (২৭ : ৬৯), 'আনকাবূত (২৯ : ১৯-২০), আর-রূম (৩০ : ০৮), আল-ফাতির (৩৫ : ৪৪) ও আল-গাফির (৪০ : ২১, ৮২)। আবার অনেক আয়াতে মু'মিনদের সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন: সূরা আলে-ইমরান (৩ : ১৩৭) অনুরূপভাবে সূরা আর-রূমে (৩০ : ৪১)। এ ছাড়া সূরা আত-তাওবা (৯ : ১১২) ও সূরা আত-তাহরীমে (৬৬ : ০৫) ভ্রমণকারী মু'মিন নর-নারীর প্রশংসা করা হয়েছে। যদিও কতিপয় তাফসীরকারক এ দুটো স্থানে سياحة শব্দের অর্থ পর্যটন বা ভ্রমণ না করে রোযার অর্থ করেছেন। সাইয়িদ রশীদ রিযার মতে, তা হল অনেক দূরবর্তী ব্যাখ্যা।[৪]

সফরের বিধান

পৃথিবীর শুরু থেকে বিভিন্ন যুগ পরিক্রমায় যারা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের অবস্থা দেখা, তাদের পরিণতি সম্পর্কে জানা এবং সে সমস্ত জাতির ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করা ও তাদের খবরাখবর শুনার জন্য জমিনে ভ্রমণ করা উচিত। কেননা কুরআনে পর্যটন ও ভ্রমণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা মূলত এ জন্যই। তবে কেউ যদি এ লক্ষ্যে সফর না করে তাহলে তার হুকুম কী হবে তা নিয়ে আলিমগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আলিমগণের কেউ কেউ বলেছেন : তা মুবাহ যেমনটি আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। অন্যরা বলেছেন: তা ওয়াজিব। সাইয়িদ রশীদ রিযার মতে, প্রকৃত সত্য হল: কুরআন উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য ছাড়াও সফরের আরো কতিপয় উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছে।

---

৩. সাইয়িদ রশীদ রিযা, *তাফসীরুল মানার*, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ২০০৫, খ. ২, পৃ. ৯৩

৪. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৫৪

সফর মূলত মুবাহ। তবে কখনো কখনো তা ওয়াজিব হয় যদি সফরটি কোন ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন করার জন্য হয়ে থাকে। যেমন: হজ্জ ও শারয়ী জিহাদ। আবার কখনো তা নফল হয় যদি তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার জন্য হয়ে থাকে। তবে যতটুকু ইলম অর্জন করা ফরযে আইন (অর্থাৎ ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানা), সফর ব্যতীত যদি তা অর্জন সম্ভব না হয় তাহলে সফর ফরযে আইন। আর যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরযে কিফায়াহ অর্থাৎ যার ওপর দেশের সংরক্ষণ, নাগরিকদের জীবনমানের উন্নয়ন, সুস্থতা ইত্যাদি নির্ভর করে, ততটুকু ইলম অর্জন করার জন্য সফর করা ফরযে কিফায়াহ। উম্মাহ ও রাষ্ট্রের জন্য কেউই যদি এ ইলম অর্জন না করে তবে সবাই গুনাহগার হবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সফর হারাম বা মাকরূহ। যেমন: ঐ সকল লোকের সফর যারা পাপাচারের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিংবা বিদেশে সফর করে।[৫]

আল-কুরআনে 'ইব্নুস-সাবীল' বা মুসাফির

কুরআন মাজীদ 'ইব্নুস-সাবীল' শব্দটি দয়ার পাত্র হিসেবে সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারীরূপে আটবার উল্লেখ করেছে। কুরআনের মক্কী অংশের সূরা আল ইসরায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না।"[৬]

তিনি আরো বলেন :

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

"এবং আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য তা শ্রেয়।"[৭]

কুরআনের মাদানী সূরাসমূহে 'ইব্নুস-সাবীল'কে ফরয কিংবা নফল অর্থব্যয়ের ক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"লোকে কী ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য।"[৮]

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-৫৫

৬. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬

৭. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৮

'ইবনুস-সাবীলে'র জন্য অর্থ ব্যয় করাকে পুণ্যের কাজ হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে।"[৯]

সূরা আন-নিসায় 'ইবনুস-সাবীলে'র সাথে সদ্ব্যবহারে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"তোমরা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[১০]

বদর যুদ্ধের পর গনীমতের মালে মুসাফিরের অধিকারের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের।"[১১]

বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত 'ফাই' সম্পদে মুসাফিরদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারী বা মুসাফিরদের।"[১২]

---

৮. আল-কুরআন, ২ : ২১৫
৯. আল-কুরআন, ২ : ১৭৭
১০. আল-কুরআন, ৪ : ৩৬
১১. আল-কুরআন, ৮ : ৪১

উপর্যুক্ত সাতটি জায়গা ছাড়াও সূরা আত-তাওবার ৬০ নং আয়াতে যাকাত ব্যয়ের একটি খাত হিসেবে মুসাফিরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা আলোচ্য প্রবন্ধের শেষের দিকে আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃস্ব পথিকের ব্যাপারে কুরআনে এতটা গুরুত্বদানের মূলে নিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা হচ্ছে: ইসলাম মানুষকে দেশ ভ্রমণ ও বিদেশ গমনের উপদেশ দিয়েছে নানাভাবে ও বিবিধ কারণে। দুনিয়ায় ঘুরে, পরিভ্রমণ করে দেখার ও উৎসাহ দানের মূলে কতগুলো কারণ নিহিত রয়েছে :

১. এক ধরনের ভ্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে রিয্ক সন্ধানের উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ তাআলা বলেন : فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
"তোমরা পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ কর।"[১৩]

তিনি অন্য স্থানে বলেছেন :
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
"কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।"[১৪]

২. আর এক প্রকারের পরিভ্রমণের জন্য ইসলাম উদ্বুদ্ধ করেছে। তা হচ্ছে জ্ঞান-শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ, বিশ্বের অবস্থা অবলোকন এবং সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে উপদেশ গ্রহণ। সাধারণভাবে সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর অনুসৃত নীতিসমূহ দেখা এবং বিশেষ করে মানবসমাজের মধ্যে নিহিত অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণের জন্য ইসলাম উদ্বুদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
"বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন।"[১৫]

তিনি আরো বলেন :
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
"তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত।"[১৬]

---

১২. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭
১৩. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫
১৪. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০
১৫. আল-কুরআন, ২৯ : ২০

দীনী জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ

"তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং ফিরে এসে তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে।"[১৭]

রাসূলুল্লাহ স. বলেন : 'যে লোক ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের পথে চলা সহজ করে দেবেন।"[১৮] "আর যে লোক ইলম সন্ধান করার উদ্দেশ্যে বের হল, সে আল্লাহর পথেই রয়েছে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।"[১৯]

৩. ইসলাম অপর এক প্রকারের ভ্রমণের আহবান জানায়। তা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে সফর। সর্বপ্রকার বিদেশী বিজাতীয় দখলদারিত্ব থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করা, ইসলামী দাওয়াতী কাজের নিরাপত্তা বিধান, দুর্বল লোকদের নিস্কৃতি সাধন ও ওয়াদা ভঙ্গকারীদের যথাযথ শাস্তি প্রদান প্রভৃতিই হচ্ছে আল্লাহর পথ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায়, এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। তাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।"[২০]

৪. আর এক প্রকারের সফরের প্রতি ইসলাম আহ্বান জানিয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর একটা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ইবাদত হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে। এটা ইসলামের অন্যতম 'রুকন'।

---

১৬. আল-কুরআন, ২২ : ৪৬

১৭. আল-কুরআন, ৯ : ১২২

১৮. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : আল-হাছছু আলা তলাবিল ইলমি, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-৩৬৪১

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ

১৯. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : ফাযলু তলাবিল ইলমি, বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরারিয়্যি, তা.বি., হাদীস নং-২৬৪৭, হাদীসটির সনদ দুর্বল (ضعيف)

عن أنسٍ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – : « مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ العِلْمِ كَانَ في سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ »

২০. আল-কুরআন, ৯ : ৪১

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।"[২১] তিনি আরো বলেন,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

"এবং মানুষের নিকট হজ্জ এর ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।"[২২]
দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও ঘুরাফেরার বিভিন্ন ধরন হতে পারে। ইসলাম এ সব সফরের জন্য আহবান জানিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে। পৃথিবীতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মুসলিমদের এ সব পরিভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছে । ইসলামের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন এভাবেই সম্ভবপর হতে পারে। এ ছাড়া আরো কয়েক ধরনের পরিভ্রমণ রয়েছে। আর ইসলামের বৈশিষ্ট্যই এখানে যে, এসব সফরে গমনকারী লোকদের প্রতি ইসলাম খুব বেশি ও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষ করে তাদের প্রতি, যারা সফরে বের হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং তার আপন লোকজন ও ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইসলাম সাধারণভাবেই এমন লোকদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার নির্দেশ দিয়েছে এং বিশেষ করে যাকাত হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে তাদের প্রয়োজন পরিমাণ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। আর তা করে ভ্রমণের পক্ষে উৎসাহ দানকে শক্তিশালী করেছে, শরীয়ত সম্মত উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণের কাজটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভ্রমণকারীদের অপরিচিত পরিমণ্ডলে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী বানিয়েছে। মুসলিম সমাজের সকল অংশই যে পরস্পর সম্পৃক্ত, দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ তার বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। এ সমাজের লোকেরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে, একের বিপদ বা অসুবিধায় অপর জন বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দেয়। এ ক্ষেত্রে ইসলাম দেশী-বিদেশীর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।

ইসলামে 'ইবনুস-সাবীল' বা মুসাফিরের সামাজিক নিরাপত্তা

ইসলাম বিদেশী, অপরিচিতের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে পড়া মুসাফিরদের ব্যাপারে যে গুরুত্ব আরোপ করেছে তা পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থার ইতিহাসে দৃষ্টান্তহীন। অপর কোন মতবাদ, সমাজ-ব্যবস্থা বা কোন বিধানই এরূপ কোন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে এটা এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, এ পর্যায়ের একক ও অনন্য ব্যবস্থা। কোন দেশে বসবাসকারী লোকদের স্থায়ী প্রয়োজন ও অভাব-অনটন দূর করার ব্যবস্থা করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। বরং ভ্রমণ ও বিদেশ গমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও কার্যকারণে মানুষ যেসব অভাব ও নিঃস্বতার সম্মুখীন হয়, তার জন্যও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ইসলামের এই বিধান

---

২১. আল-কুরআন, ৩ : ৯৭

২২. আল-কুরআন, ২২ : ২৭

অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে যখন পথে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে, বর্তমান যুগের মতো হোটেল, রেস্তোরাঁ কোথাও ছিল না।

কার্যত আমরা দেখতে পাচ্ছি, 'উমর ইব্‌নুল খাত্তাব রা. তাঁর খিলাফত আমলে একটা ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং তার ওপর লিখে দিয়েছিলেন 'দারুদ্দাকীক' অর্থাৎ ময়দার ঘর। তার কারণ সে ঘরে ময়দা, আটা, খেজুর, পানি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে রাখা হতো। যেসব নিঃস্ব পথিক ও অতিথি তাঁর নিকট আসত সেসব দিয়ে তাদের সাহায্য করা হতো। অনুরূপভাবে মক্কা ও মদীনার দীর্ঘ পথের মাঝেও 'উমর রা. অনুরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নিঃস্ব লোকেরা এখান থেকে যথেষ্ট উপকৃত হত এবং একটা স্থান থেকে পানি নিয়ে পরবর্তী স্থানে পৌঁছাতে পারত।[২৩]

পঞ্চম খলীফা হিসেবে খ্যাত উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয রা.-এর সময়কার ব্যবস্থা সম্পর্কে আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন, তিনি ইমাম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরীকে রা. যাকাত-সাদাকা সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ স.-এর বা খুলাফা রাশিদূনের যেসব সুন্নাত বা হাদীস মুখস্ত আছে তা তাঁর জন্য লিখে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তিনি একখানি দীর্ঘ লিপি লিখে পাঠিয়েছিলেন। তাতে প্রত্যেকটি অংশ আলাদা আলাদা করে দেয়া হয়েছিল।

এ লিপিতে 'ইব্‌নুস-সাবীল' পর্যায়ে এ কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে: 'ইব্‌নুস সাবীল' এর অংশটি প্রত্যেক রাস্তায় তার চলাচলকারী লোকদের সংখ্যানুপাতে বিভক্ত করা হবে। রাস্তায় যে কোন নিঃস্ব পথিক- যার কোন আশ্রয় নেই, আশ্রয় দেয়ার মত কোন পরিবারও নেই তাকে খাওয়াতে হবে, যতক্ষণ না সে একটা আশ্রয়স্থল পেয়ে যায় বা তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। উপরন্তু, উক্ত ইবনুস সাবীলের অংশটি রাস্তায় সুপরিচিত মনযিলগুলোতে বিশ্বস্ত লোকদের নিকট ন্যস্ত করতে হবে। যখনই কোন নিঃস্ব পথিক সেখানে উপস্থিত হয়, তারা তাকে আশ্রয় দেবে ও খাবার দেবে এবং তার সঙ্গে বাহন জন্তু থাকলে তার খাবারের ব্যবস্থাও করবে– যতক্ষণ তাদের নিকট রক্ষিত দ্রব্যাদি নিঃশেষ হয়ে না যায়। ইনশাআল্লাহ।"[২৪]

অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন পথিকের জন্য এরূপ ব্যবস্থা বিশ্বমানব ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদে বা ব্যবস্থায় দেখেনি। ইসলামী ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থায় এরূপ সামাজিক নিরাপত্তা কোথাও পাওয়া যায় না। মুসলিম উম্মাহ ছাড়া দুনিয়ার অপর কোন উম্মত এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি।

যাকাত ব্যয়ের একটি খাত হল 'ইবনুস-সাবীল'

মুসাফির তার নিজের গৃহে ধনী হলেও সফরের মধ্যে সে যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে যাকাতের অর্থ দ্বারা তাকে সাহায্য করা যাবে। যাকাতের অর্থই নিঃস্ব ও

২৩. ইব্‌ন সা'দ, *তাবাকাত,* বৈরূত : তা.বি., খ. ৩, পৃ. ২৮৩

২৪. আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, ইসলামাবাদ, ইদারাতু তাহকীকাতি ইসলামী, ১৯৮৬, পৃ. ৫৮০

মুখাপেক্ষী মুসাফিরকে সামাজিকভাবে নিরাপত্তা দেয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে অপমানিত, পর্যুদস্ত, লাঞ্ছিত হতে না দিয়ে বরং তাকে সসম্মানে নিজ গৃহে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অভাবী মুসাফিরকে যাকাত থেকে দান করার কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। তা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[২৫]

এ আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, অন্যান্য খাতের ন্যায় নিঃস্ব মুসাফিরদের অভাব অনটন দূর করে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও নিরাপদে তাঁদেরকে তাঁদের বাড়ি-ঘর ও পরিবার-পরিজনদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যাকাতের অন্যতম একটি লক্ষ্য।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সায়্যিদ রশীদ রিযা বলেন :
মুসলিম ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'ইবনুস-সাবীল' বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে সফরে স্বীয় দেশ থেকে দূরে এমন কোন স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যেখানে তার নিজের অর্থ-সম্পদ থাকলেও তা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তিকে তার সাময়িক আর্থিক অসহায়ত্বের জন্য যাকাতের টাকা দেয়া যাবে, যা তাকে তার স্বদেশে পৌঁছতে সাহায্য করবে। এটা ভ্রমণ ও পর্যটনের জন্য ইসলামের সাহায্য। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থায় বা অন্য কোন শরীয়তে এর নযীর নেই অর্থাৎ এটি শুধু ইসলামেরই অনন্য ব্যবস্থা।[২৬]

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন : "ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত বৈধ নয়, তবে সে যদি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ হয় অথবা মুসাফির হয় অথবা কোন গরীব প্রতিবেশী যদি তাকে যাকাতের সম্পদ থেকে কোনা উপহার দেয় বা খাবার খেতে আহবান করে তখন তার জন্য তা বৈধ"।[২৭]

---

২৫. আল-কুরআন, ৯ : ৬০

২৬. সায়্যিদ রশীদ রিযা, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৪১

২৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মান ইয়াজুযু লাহু আখযুস-সাদাকাতি ওয়াহুয়া গানিয়্যুন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৩৭, হাদীসটির সনদ দুর্বল (ضعيف)

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِى لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ ».

ইমাম তাবারী মুজাহিদ রা. থেকে বর্ণনা করেন :
"'ইব্‌নুস-সাবীল' বা পথিক ব্যক্তি যদি ধনী হয়, তবুও যাকাতের সম্পদে তার একটা হক রয়েছে, যদি সে তার নিজের ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।" ইব্‌ন যায়দ বলেন : 'ইব্‌নুস-সাবীল' মানে মুসাফির, পথিক সে ধনী হোক, কি গরীব উভয় অবস্থায়ই যদি সে স্বীয় প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ব্যাপারে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সম্পদ হারিয়ে ফেলে অথবা অন্য কোন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে অথবা তার হাতে যদি কোন সম্পদই না থাকে, তাহলে তার এ হক অবশ্যই প্রাপ্য।[২৮] ইব্‌ন নুজাইম রহ. বলেছেন, মুসাফির যে দূরে কোথাও গিয়ে মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে যদি নিজ এলাকায় এমন ধনী হয় যে, তার মালে যাকাত ওয়াজিব, কিন্তু বর্তমানে তার হাতে কোন সম্পদ না থাকার ফলে তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তাকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।[২৯]

'ইব্‌নুস-সাবীল'কে যাকাত দেয়ার শর্ত

কয়েকজন ফকীহ বা ইসলামী আইনবেত্তার মতে 'ইব্‌নুস-সাবীল' বা মুসাফিরকে যাকাতের অংশ দেয়ার ব্যাপারে কতিপয় শর্ত রয়েছে সেগুলো হল :

প্রথম শর্ত : মুসাফির যে স্থানে রয়েছে, সে স্থান থেকে তার দেশে ফেরার জন্য তাকে সে স্থানেই অভাবগ্রস্ত হতে হবে। যদি তার নিকট নিজ দেশে পৌঁছার মত অর্থ-সম্পদ থাকে, তাহলে তাকে যাকাতের অংশ থেকে দেয়া যাবে না। কেননা যাকাত দানের উদ্দেশ্য হল তাকে তার দেশে পৌঁছানো।

দ্বিতীয় শর্ত : তার সফর এমন হতে হবে যাতে কোন পাপের সংকল্প করা হয়নি। যার সফর পাপ করার জন্য হয়, যেমন : কাউকে হত্যা করা অথবা হারাম ব্যবসা করা অথবা এরূপ কিছু হলে তাকে যাকাতের মাল থেকে সামান্যও দেয়া যাবে না। কেননা এমন অবস্থায় তাকে সম্পদ দেয়ার অর্থ হলো পাপ কাজে তাকে সাহায্য করা, আর মুসলিমদের সম্পদ দ্বারা আল্লাহর সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে সাহায্য করা বৈধ নয়। তবে সে যদি খালিসভাবে তাওবা করে, তবে তার অবশিষ্ট সফরের খরচ বাবদ দেয়া যাবে। তার যদি অভাবে মরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়, তাহলে তাওবা না করলেও তাকে দেয়া যাবে। কেননা যদিও সে সীমালঙ্ঘন করে তবুও তাকে মরতে দিয়ে আমরা (মুসলিম সমাজ) সীমালঙ্ঘন করতে পারি না।

আর যে সফর কোন পাপ কাজের জন্য করা হয়নি তা ইবাদতের জন্য হতে পারে, কোন প্রয়োজনের জন্য হতে পারে বা বিনোদনের জন্যও হতে পারে। ইবাদতের সফর যেমন হজ্জ, জিহাদ ও উপকারী ইলম সন্ধান এবং বৈধ যিয়ারতের সফর ইত্যাদি। সেসব মুসাফিরকে যাকাত দেয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেননা

---

২৮. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিকহুয যাকাত,* বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০, খ. ২, পৃ. ৬৭০
২৯. ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রা'য়িক,* পৃ. ২৪২

ইবাদতের কাজে সাহায্য তো শরীয়তে কাম্য। আর দুনিয়ার প্রয়োজনে যে সফর করা হয় যেমন ব্যবসার জন্য সফর, রিয্ক বা জীবিকার জন্য সফর। এদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে : এ ধরনের পথিক বা মুসাফিরকেও যাকাত দেয়া যাবে। কেননা এতে মুসাফিরের বৈধ পার্থিব প্রয়োজন পূরণে ও তার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে তাকে সহায়তা করা হয়।

তৃতীয় শর্ত : মুসাফির যে স্থানে আছে সেখানে তাকে ঋণ দেয়া বা অগ্রিম দেয়ার মত কাউকে না পাওয়া। এটা সে মুসাফিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যার নিজ এলাকায় ঋণ বা অগ্রিম হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ পরিশোধ করার মত সম্পদ ও সামর্থ্য রয়েছে।[৩০]

শর্তসমূহের পর্যালোচনা

মুসাফির হল যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের একটি। আল্লাহ তাআলা তার যাকাত পাওয়ার জন্য সফরকে শর্ত হিসেবে আরোপ করেছেন। সুতরাং স্বগৃহে ধনী হলেও সফর অবস্থায় সে অভাবী বা মুখাপেক্ষী হলে তাকে যাকাতের টাকা থেকে দান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে তার নিঃস্বতাই যাকাত লাভের জন্য যোগ্য হওয়ার কারণ। এর সাথে অন্য কোন শর্ত আরোপ করা সমীচীন নয়। যেমন কতিপয় ফকীহ মনে করে থাকেন। কেননা কুরআনের কোথাও মুসাফিরের যাকাত পাওয়ার জন্য শর্ত আরোপ করা হয়নি।

বারীরার রা. হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন :

"আল্লাহর কিতাবে নেই এমন প্রত্যেক শর্ত বাতিল। যদিও তা একশটি শর্ত হয়।"[৩১]

তাছাড়া অন্য কোন হাদীসেও মুসাফিরের যাকাত পাওয়ার জন্য কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি।

কোন কোন আলিমের মতে, মুসাফিরের যাকাত পাওয়ার জন্য সফরটি অসৎকাজের উদ্দেশ্যে হওয়া যাবে না বলে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা ঠিক নয়। কেননা কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ ধরনের কোন শর্ত নেই। অন্যদিকে দীনের মৌলিক শিক্ষা হল অভাবী ও মুখাপেক্ষী ব্যক্তির পাপাচার তার সাহায্য লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। বরং পাপী ও অসৎচরিত্রের লোকদেরকে বিপদে সাহায্য করলে এবং ভাল ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চরিত্র সংশোধন করার চেষ্টা করলে তা তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য সবচেয়ে বড় উপায় হতে পারে। পবিত্র কুরআনে সে কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

---

৩০. ড. ইউসূফ কারযাভী, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৮-৮০

৩১. ইমাম আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, *শরহু মা'আনিল আছার*, দেওবন্দ, আল-মাকতাবুল আশরাফিয়া, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২২৬

إن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال في حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط

"ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।"[৩২]
তবে অধিকাংশ ইমাম এ কথার সাথে এক মত নন। তাঁদের মতে, সফরটি পাপ কাজের জন্য হওয়া যাবে না। সাইয়িদ রশীদ রিযা বলেন : এ শর্তটি শরীয়তের একটি সাধারণ নিয়মের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত। সেটি হচ্ছে "তাকওয়া ও পুণ্য কাজে সহযোগিতা করা এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে সাহায্য না করা।"[৩৩]

বর্তমান যুগে 'ইব্‌নুস-সাবীল'

যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজলভ্যতা, দ্রুততা ও বিচিত্র ধরনের কারণে সমকালীন কোন কোন আলিম মনে করেন, বর্তমান যুগে ইব্‌নুস-সাবীল পাওয়া যায় না। তাঁরা মনে করেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ক্ষিপ্রতা ও বৈচিত্র্যের কারণে বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব একটি দেশের ন্যায়, অধুনা যাকে বলা হয় 'গ্লোবাল ভিলেজ'। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণ সহজলভ্য উপায়-উপকরণের কারণে মানুষ পৃথিবীর যে কোন স্থানে থেকে ব্যাংক বা অন্যান্য উপায়ে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ-সম্পদ লাভ করতে পারে।

উপর্যুক্ত মতটি মরহূম শায়খ আহমাদ মুস্তাফা আল-মুরাগী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান কালের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী তাঁর এ মতের (যে কোন দেশে থেকে অর্থ-সম্পদ লাভ করার সহজলভ্যতার ধারণার) বিরোধী। তাঁর মতে, বর্তমান যুগেও বিভিন্ন রূপে ইবনুস-সাবীল বা মুসাফির পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগে ইবনুস-সাবীলের বাস্তব রূপ :

সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন

মানুষের মাঝে এমন অনেকে রয়েছেন যারা ধনী বটে; কিন্তু তাঁরা তাঁদের সম্পদ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন বিধায় তাঁরা তা লাভ করতে পারেন না। অথবা যে ব্যাংকে তাঁদের টাকা রয়েছে তাঁরা সে ব্যাংক থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে তারা তা লাভ করতে পারেন না। অথবা তাঁরা বিভিন্ন কারণে এমন দূর প্রান্তের কোন গ্রাম অথবা জনমানবহীন মরুভূমিতে রয়েছেন যেখান থেকে শহরের ব্যাংকে পৌঁছা এবং টাকা তোলা সম্ভব নয়। এ ধরনের লোকেরা ইবনুস-সাবীল রূপে গণ্য হবেন। কেননা তাঁরা তাঁদের মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। অতএব, তাঁরা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। এটা বর্তমান কালের মুসাফিরের একটি রূপ, যা হঠাৎ পাওয়া যায় যদিও তা বিরল।

দেশ থেকে বিতাড়িত এবং অন্যদেশে আশ্রিত

শাসকশ্রেণী অন্যায়ভাবে অনেক মুসলিমকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। ফলে তাঁরা তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁরা তাদের দীন ও

---

৩২. আল-কুরআন, ৪১ : ৩৪
৩৩. সায়্যিদ রশীদ রিযা, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৪১

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার্থে নিজ দেশ ছেড়ে অন্যদেশে আশ্রয় নেয়। স্বদেশে তাঁদের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা হয় বা অন্য কোন কারণে তাঁরা তাদের টাকা পয়সা থেকে বঞ্চিত থেকে বিদেশ-বিভুইয়ে খুব কষ্ট-কাঠিন্যের সম্মুখীন হয়। এমনটি ঘটে থাকে বহু নিপীড়িত-বিতাড়িত-বহিস্কৃত ও বিদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রাজনীতিক বা সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে। নিজের দেশে তাঁদের মাল বা সম্পদ আছে, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা অসহায়, তাঁদের সম্পদে তাদের কোন হাত নেই। খাতা-কলমে তাঁরা ধনী হলেও বাস্তবে তাঁরা ফকীর। এ সকল লোক ইবনুস-সাবীল হিসেবে গণ্য হবেন।

স্বীয় দেশে সম্পদের উপর যার কর্তৃত্ব নেই

হানাফী ফকীহদের কেউ কেউ ঐ লোককেও ইবনুস-সাবীল হিসেবে গণ্য করেন, নিজ দেশে যার মাল বা সম্পদ আছে; কিন্তু তাতে তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই। অন্যদের হস্তক্ষেপ বা দখলের কারণে তিনি তা ভোগ করতে পারছেন না। তাদের কথা হল অভাবই বিবেচ্য বিষয়। সে যেহেতু বাস্তবে ফকীর যদিও বাহ্যিকভাবে সে ধনী। তাঁরা বলেন, যদি কোন ব্যবসায়ী এমন হয় যে, সে মানুষের কাছে অনেক টাকা পাবে কিন্তু সে তা তুলতে পারছে না এবং জীবনধারনের জন্য তাঁর অন্য কোন উপায়ও নেই। তাঁর জন্যও যাকাত গ্রহণ বৈধ। সেও ইবনুস-সাবীলের মতই।[৩৪]

কল্যাণকর কাজের জন্য মুসাফির

শাফিয়ী মাযহাব অনুযায়ী যে লোক বিদেশ গমনের ইচ্ছা করে; কিন্তু প্রয়োজনীয় খরচের অর্থ না পায় সেও 'ইব্‌নুস-সাবীল'-এর অন্তর্ভুক্ত। ড. কারযাভীর মতে, এ ক্ষেত্রে সফরটি ইসলামের কল্যাণে অথবা মুসলিম উম্মার কল্যাণে হতে হবে। এ শর্তানুযায়ী যে কেউ উম্মাহর বা ইসলামের কল্যাণে সফর করলে সে ইবনুস-সাবীল হিসেব গণ্য হবে। যেমন: প্রতিভাবান ছাত্র, দক্ষ প্রকৌশলী, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা কারিগর। উচ্চ শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণের জন্য তাঁদের বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, যার কল্যাণকর প্রভাব উম্মাহ এবং দীনের ওপরই বর্তাবে।

ঠিকানা বঞ্চিত

হাম্বলী মাযহাবের কতিপয় আলিম 'ইব্‌নুস-সাবীল' এর আরেকটি ব্যাখ্যা দেন। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ যুগের বহুসংখ্যক লোক 'ইব্‌নুস-সাবীল' হিসেবে গণ্য হতে পারে। তাঁদের মতে, যারা রাস্তায় পথিকদের জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা করে তারাও 'ইব্‌নুস-সাবীল'। আমরা সবসময় দেখি যে, অনেক দেশের মুসলিম অধিবাসীগণ আশ্রয় ও আবাসভূমি থেকে বঞ্চিত হয়ে রাজপথের আশ-পাশ ও ফুটপথকে তারা তাদের ঠিকানা বানিয়েছে। রাস্তার ধুলা-বালিই তাদের বিছানা এবং বাতাসই তাদের

---

৩৪. ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রা'য়িক,* খ. ২, পৃ. ২৪২

পোশাক। এরাই প্রকৃত অর্থে 'ইব্নুস-সাবীল' বা রাস্তার সন্তান। কেননা রাস্তাই তাদের একমাত্র ঠিকানা।[৩৫]

কুড়িয়ে পাওয়া শিশু

সাইয়িদ রশীদ রিযা তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুড়িয়ে পাওয়া শিশুও 'ইব্নুস-সাবীলে'র অর্থের মধ্যে গণ্য। তিনি এও লিখেছেন যে, সমকালীন বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতে,'ইব্নুস-সাবীল' দ্বারা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুই উদ্দেশ্য। রশীদ রিযা তাঁদের এ মতকে শক্তিশালী করেছেন। যদিও তিনি এ মতটিই ঠিক একথা নিশ্চিত করে বলেননি। কেননা ইব্নুস-সাবীল শব্দটি অন্য যে কোন অর্থের চেয়ে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু অর্থে ব্যবহৃত হওয়া যুক্তিযুক্ত। আর যেহেতু কুরআন বিশেষ হিকমতের কারণেই ইয়াতীম শিশুদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তা হল পিতা না থাকার কারণে তার তা'লীম-তারবিয়াত কোন কিছুই সঠিকরূপে হয় না। ফলে তার আখলাকে ত্রুটি দেখা দেয় এবং এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সমাজের অন্যান্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যাদের সাথে সে মিশে। এ কারণে যেহেতু কুরআন ইয়াতীমদের ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্বারোপ করেছে, সেহেতু কুড়িয়ে পাওয়া শিশুরা ইহ্সান পাওয়ার ক্ষেত্রে ইয়াতীমদের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।[৩৬]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান কর্মতৎপরতার যুগে মানুষ তাদের চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি প্রয়োজনে সফর করে। সফরের সময় পকেটমারা বা টাকা-পয়সা হারিয়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে নিঃস্ব হওয়া সহ মুসাফির নানান কারণে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেকে আবার নদীভাঙ্গন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস কিংবা ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে সবকিছু হারিয়ে শহর, বন্দর ও নগরীর রাস্তায় জীবনযাপন করে। এদের কথা ইসলাম ভুলে যায়নি। বরং তাদের অকস্মাৎ দুঃখ, দুর্দশা মোচনের ব্যবস্থা হিসেবে সমাজের অন্যদেরকে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এটা সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোন দয়া বা অনুকম্পা নয়; বরং তাদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার। সামর্থ্যবানদের উচিত, অসহায় মুসাফিরদের সাময়িক আর্থিক সমস্যার সমাধান করা। তাহলে তারা যখন পথিমধ্যে বিপদে পড়বে তখন অন্যরা তাদের পাশে এসে দাড়াবে। এভাবে সমাজের প্রতিটি সদস্য সফর করা অবস্থায় একে অপরের ইসলাম নির্দেশিত সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

---

৩৫. আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন সুলায়মান আল-মারদাবী, *আল-ইনসাফ*, দারু ইহয়াহত তুরাসিল আরাবী, ১৯৮০, খ. ০৩, পৃ. ২৩৭

৩৬. ড. ইউসূফ কারযাভী, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৬
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৩

ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল-হারাম পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা

মোঃ আবদুল মান্নান*

[**সারসংক্ষেপ :** *জীবনোপকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ব্যবসা-বাণিজ্য। বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত বেশী মনোযোগ দেয়, অর্থনৈতিকভাবে সে জাতি তত বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে যে জাতির এ ব্যাপারে আগ্রহ নেই, তারা সর্বদা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এ জন্য এ মাধ্যমটির সম্প্রসারণ করা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য যেমন জরুরী, তেমনি রাষ্ট্র বা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব ও কতর্ব্য। ইসলাম তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে একে দু'ভাগে ভাগ করেছে। এর একটি হল হালাল বা বৈধ, অপরটি হল হারাম বা অবৈধ। প্রথমটির ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে আর দ্বিতীয়টির ব্যাপারে নিন্দা করেছে এবং তা প্রতিরোধের জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবসা-বাণিজ্যের এ হালাল ও হারাম পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।*]

প্রস্তাবনার পক্ষে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও এর কারণ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।"[১]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন,

"হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট এবং এতদু'ভয়ের মধ্যে রয়েছে কিছু সংশয়যুক্ত বস্তু।"[২]

কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যে সব বিষয়কে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় তা হালাল। আর যে সব বিষয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা করা

---

* সিনিয়র লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, (জি.ই.ডি) বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. আল-কুরআন, ৬ : ১১৯

২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ফাযলু মান ইসতাবরাআ লি-দীনিহি, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৮, হাদীস নং-৫২

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

হয়েছে তা হারাম।[৩] হালাল-হারাম বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। আধুনিক পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভিত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিষয়টি উপেক্ষা করে চলা হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হল, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের যে দিক নির্দেশনা রয়েছে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব। অতএব, ব্যবসা-বাণিজ্যের হালাল-হারাম পদ্ধতিগুলো জানা প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কর্তব্য।

ব্যবসার সংজ্ঞা

মানুষের জীবনে অভাব অপরিসীম। এ অপরিসীম অভাব পূরণের জন্য মানুষ নানা রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। অভাববোধ ও অভাব পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎপত্তি। প্রাচীন Bysing থেকেই আধুনিক Business শব্দটি এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ-ব্যবসা হলেও এর দ্বারা যে কোন কাজ বা পেশায় নিয়োজিত বা ব্যস্ত থাকাকে বুঝায়। পরিভাষায়, পণ্য দ্রব্য উৎপাদন অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে ব্যবসা বলে।

Oxford Advamced Learner's Dictionary তে বলা হয়েছে "The activity of making, buying, selling or supplying goods or services for money"[৪]

ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরবীতে بيع (বাই')[৫] تجارة (তিজারাহ)[৬] এবং شراء (শিরা)[৭] বলে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেনদেনের স্বচ্ছতা, বৈধতা ও সুষ্ঠুতা নিম্নোক্ত নীতিমালার ওপর নির্ভরশীল :

১. ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতা যেহেতু পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই বাণিজ্যিক ব্যাপারে উভয় পক্ষের সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে। মুনাফার ক্ষেত্রে একজনের বেশী মুনাফা আর অপরজনের বেশী লোকসান, এটা যেন না হয় এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয় উল্লেখ করে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৩. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ৬২১

৪. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (U.K. : Oxford press, six edi, 2005-2006, p. 160

৫. ইবরাহীম মাদকুর, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, ইস্তামবুল : দারুদ দাওয়াহ, তা.বি., পৃ. ৭৯

৬. প্রাগুক্ত, ৮২

৭. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবন আবদুল কাদির আর-রাজী, *মুখতারুস সিহাহ*, কায়রো : দারুল হাদীস, তা.বি., পৃ. ১৯১

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে একে অন্যকে সাহায্য করবে না।"[৮]

২. কারবারে উভয় পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি থাকা আবশ্যক। জোরপূর্বক সম্মতি আদায় করার অবকাশ নেই। এ ধরনের সম্মতি বৈধ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[৯]

৩. চুক্তি সম্পাদনকারীর মাঝে ব্যবসার যোগ্যতা থাকতে হবে। তাকে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অবুঝ অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগল হলে ব্যবসার চুক্তি সহীহ হবে না।

আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন-"তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয় (অর্থাৎ তাদের দোষ-ক্রটিগুলো আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় না)। তারা হলো- ক. ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত, খ. অপ্রাপ্ত বয়স্ক বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ও গ. পাগল সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত।"[১০]

১. ব্যবসার হালাল পদ্ধতিসমূহ

১.১ বাই' মুরাবাহা (بيع المرابحة) (লাভে বিক্রয়)

মুরাবাহা শব্দটি আরবি 'রিবহুন' (ربح) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। 'রিবহুন' এর আভিধানিক অর্থ লাভ।[১১] ব্যবহারিক অর্থে মুরাবাহা হল : প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করা।[১২]

বাহরাইন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI[১৩] বাই' মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে :

---

৮. আল-কুরআন, ৫ : ২

৯. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

১০. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তালাক, অনুচ্ছেদ : মান লা ইয়াকাউ তলাকুহু মিনাল আযওয়াজ, বৈরূত : দারুল মারিফা, ৫ম সংস্করণ, ১৪২০ হি., খ. ৬, পৃ. ৪৬৮, হাদীস নং-৩৪৩২; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুন নাসায়ী*, হাদীস নং-৩৪৩২

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ».

১১. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আর-রাজী, *মুখতারুস সিহাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

১২. আবুল হাসান আলী ইবন আবী বকর আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া শরহে বিদায়াতুল মুবতাদী*, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৫৬

المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح

"ক্রয়মূল্যের ওপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রি করাকে বাই' মুরাবাহা বলা হয়। এই লাভ বিক্রয়মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা থোক-ও হতে পারে।"[১৪]

বাই' মুরাবাহা দু'প্রকার। যথা :

ক. মুরাবাহা 'আদিয়া (Ordinary Bai-Murabaha) : ক্রেতার অনুরোধ ছাড়াই বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে বিক্রি করাকে বাই' মুরাবাহা 'আদিয়া বলা হয়।

খ. মুরাবাহা লিল আমির বিশশিরা' (Bai-Murabaha on order) : ক্রেতার অনুরোধে তার চাহিদা মোতাবেক বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্রেতার কাছে বিক্রি করাকে বাই' মুরাবাহা লিল আমির বিশশিরা' বলা হয়। এ ধরনের মুরাবাহাকে ব্যাংকিং মুরাবাহাও বলা হয়।

পণ্যের মূল্য পরিশোধের দিক থেকে বাই' মুরাবাহা আবার দু'প্রকার। যথা :

ক. মুরাবাহা বিন নাক্‌দ : মুরাবাহার ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধিত হলে তাকে মুরাবাহা বিন নাক্‌দ বলা হয়।

খ. মুরাবাহা বিল আজাল : আর পণ্যের মূল্য ভবিষ্যতের কোন সুনির্দিষ্ট সময় (বাকিতে) পরিশোধের অঙ্গীকার করা হলে তাকে মুরাবাহা বিল আজাল বলা হয়।

মুরাবাহার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতি থাকায় এটি বৈধ। এ প্রসঙ্গে দাউদ ইব্‌ন সালিহ্ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি আবু সাঈদ খুদরী রা.-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।"[১৫]

---

১৩. AAOIFI এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরী'আর নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করার নিমিত্তে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী আলজেরিয়ায় এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় বাহরাইনে অবস্থিত। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সংরক্ষণ, পরিচালনা মূলনীতি, লেনদেন পদ্ধতি ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন দিক ও বিভাগে শারঈ মান নির্ধারণ করা এর মূল কাজ

১৪. Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (AAOIFI) শরীআহ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং-৮, মে ২০০২, পৃ. ১৩২

১৫. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : বাইউল খিয়ার, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৭৩৭, হাদীস নং-২১৮৫; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح)

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. বলেছেন-"এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনিয়তা রয়েছে। কেননা, যিনি ব্যবসা ভাল বোঝেন না তিনি দক্ষ ব্যবসায়ীর ওপর নির্ভর করতে পারেন। দক্ষ ব্যবসায়ী দেখে-শুনে যে পণ্যটি ক্রয় করেছেন কিছু লাভ দিয়ে সে পণ্যটি তার নিকট থেকে ক্রয় করতে পারলে উক্ত অদক্ষ ব্যক্তি খুশিই হবেন।[১৬]

১.২ বাই' মুয়াজ্জাল (البيع المؤجل) (বাকিতে বিক্রয়)

মুয়াজ্জাল শব্দটি আরবি আজাল (أجل) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ-বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি, নগদের বিপরীত ক্রয়-বিক্রয়।[১৭] পরিভাষায়-এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকিতে (বিলম্বে) পরিশোধ করা হয়।[১৮]

বাই' মুয়াজ্জাল হালাল হওয়ার পক্ষে হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে-"আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে বাকিতে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন এবং তার কাছে একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।"[১৯]

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন-"তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে। আল-বাই' ইলা আজাল (বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়), মুক্বারাযা (মুদারাবা) এবং ঘরে খাওয়ার জন্য গমকে যবের সাথে মিশানো; বিক্রির জন্য নয়।"[২০]

বাই' মুয়াজ্জাল হালাল না হলে মানুষের জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেত। মানুষের জীবনে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সবসময় তার হাতে নগদ অর্থ থাকে না। এমতাবস্থায় মানুষ বাকিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে পণ্য ক্রয় করে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে।

১.৩ বাই' সালাম (অগ্রিম ক্রয়)

বাই' সালাম এর আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে বাই' সালাফ। ইরাকিরা যাকে বাই' সালাফ বলে হিজাজিরা তাকে বাই' সালাম বলে। অভিধানে সালাম অর্থ-সমর্পণ করা,

---

১৬. আবুল হাসান আল-মারগীনানী *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬

১৭. ইবরাহীম মাদকুর, *আল মু'জামুল ওয়াসীত* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১৮. আলী হায়দার আমীন আফিন্দী, *দুরারুল হুক্কাম ফি ইলমিল আহকাম*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, তা. বি., পৃ. ১১৪

১৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : শিরাইন নাবিয়্যি স. বিন-নাসিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭২৯, হাদীস নং-১৯৬২
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَرَى مِنْ يَهُودِىٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

২০. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আশ-শারিকাতু ওয়াল মুযারাআহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬৮, হাদীস নং-২২৮৯
ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ.
উল্লেখ্য যে, হাদীসটি অত্যন্ত দূর্বল। কেউ কেউ মাওদূ' (জাল)ও বলেছেন। (সুয়ূতী, আল-লা'আলিল মাসনূ'আহ, খ. ২, পৃ. ১২৯)

সালাফ অর্থ- অতিক্রান্ত হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে বাই' সালাম বলে। অনুরূপভাবে পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদান করা হয় বলে একে বাই' সালাফ বলে। আর পরিভাষায়- "অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বাই' সালাম বলে।[২১]

আল্লাহ বলেছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
"হে ঈমারদারগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে কোন ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখ।"[২২]

উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রা. বলেছেন-"আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সালাফ (বাই' সালাম) নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানকৃত একটি চুক্তি। একে আল্লাহ তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। ইব্ন আব্বাস রা. আরো বলেন, এই আয়াত বাই' সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[২৩]

বাই' সালাম হালাল হওয়ার পক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে : "ইব্ন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. মদীনায় আগমন করলে লোকেরা এক বছর ও দুই বছরের জন্য সালাফ করতো। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, খেজুরের ক্ষেত্রে কেউ সালাফ করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের মধ্যে করে।[২৪]

---

২১. Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (AAOIFI) শরী'আহ স্ট্যান্ডার্ড, মে ২০০২, পৃ. ১৮০

২২. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

২৩. ইমাম হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহায়ন*, তাহকীক : মুসতফা আব্দুল কাদির আতা, অধ্যায় : আত-তাফসীর, অনুচ্ছেধ : মিন সূরাতিল বাকারাহ, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./ ১৯৯০ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৩১৪, হাদীস নং-৩১৩০; হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ (صحيح) কিন্তু তারা তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেননি।

عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي الكتاب و أذن فيه قال الله عز و جل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه

২৪. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক : শুয়াইব আল-আরনাউত ও অন্যান্য, অধ্যায় : মিন মুসনাদি বানী হাশিম, অনুচ্ছেদ : মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্বাস ইবনিল আব্দিল মুত্তাবিল আনিন নাবিয়্যি সা., বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ৩৬২, হাদীস নং-১৮৬৮; হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ (صحيح)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ ، أَوْ قَالَ : عَامَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ – فَقَالَ : مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.

বাই‘ সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে সাহাবীগণ একমত পোষণ করেছেন যে, একে অন্যের সাথে নির্দিষ্ট ধরনের পণ্যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপে নির্দিষ্ট মেয়াদে বাই‘ সালাম করতে পারে। উল্লেখ্য যে, বাই‘ সালামকে বাই‘ আল মাহাভীজও বলা হয়। কেননা এর মাধ্যমে অভাবী লোকদের অভাব পূরণ হয়।[২৫]

বাই‘ সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে :

পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত :

১. পণ্য সরবরাহের সময় সুনির্দিষ্ট হতে হবে।[২৬]
২. পণ্য সরবরাহকালীন সহজলভ্য হওয়া, পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া।[২৭]
৩. পণ্যকে বিক্রেতার দায় হিসেবে গণ্য করা। যে পণ্য সরবরাহের চুক্তি হয়েছে কেবল সেটা সরবরাহ করাই তার দায়িত্ব।
৪. চুক্তিতে পণ্যের নাম, ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদিও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।[২৮]
৫. বাই‘ সালামের পণ্য বিবরণযোগ্য ও ভবিষ্যতে সরবরাহযোগ্য হতে হবে। পণ্যের বিবরণের ক্ষেত্রে এমনভাবে উল্লেখ করাই যথেষ্ট যাতে কিছুটা উল্লেখ না করলে সাধারণত মানুষ তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না এবং এর ফলে কোন বিবাদও হয় না।[২৯]
৬. পণ্য সরবরাহের স্থান নির্দিষ্ট হতে হবে। এটি একটি মৌলিক বিষয়। উভয়পক্ষ যদি পণ্য সরবরাহের স্থান সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকেন, তাহলে চুক্তির স্থানটিকে পণ্য সরবরাহের স্থান হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে তাতে কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রচলিত প্রথাভিত্তিতে স্থানটি নির্ণীত হবে এবং বিক্রেতা সেখানেই পণ্য সরবরাহ করবেন।[৩০]

মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত :

১. বাই‘ সালামে পণ্যের মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে। মূল্য নগদ হলে মুদ্রার ধরন, পরিমাণ ও পরিশোধের পন্থা, উপায়/ধরন উল্লেখ থাকতে হবে। আর পণ্য হলে তার প্রকৃতি, শ্রেণী, বিবরণ ও পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে।[৩১]

---

[২৫] আস্-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭১, খ. ৩, পৃ. ১২১

[২৬] Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (AAOIFI) শরী‘আহ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০(৩/২/৯), মে ২০০২, পৃ. ১৭১

[২৭] প্রাগুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০(৩/২/৮), মে ২০০২, পৃ. ১৭১

[২৮] প্রাগুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০(৩/২/৭), মে ২০০২, পৃ. ১৭১

[২৯] প্রাগুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০(৩/২/৫), মে ২০০২, পৃ. ১৭০

[৩০] প্রাগুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০(৩/২/১০), মে ২০০২, পৃ. ১৭১

[৩১] প্রাগুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০(৩/১/২), মে ২০০২, পৃ. ১৭১

২. বাই' সালাম চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা।[৩২] চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধ না করা হলে সালাম চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা অধিকাংশ ফকীহর মত। কারণ, চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধ না করা হলে এটা বাই'য়ুদ দাইন বিদ দাইন (অর্থাৎ যে বেচাকেনায় পণ্য ও মূল্য দুটিই বাকী থাকে) হিসেবে গণ্য হবে। আর রাসূলুল্লাহ্ স. এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৩৩] অবশ্য ইমাম মালিক র. তিন দিন পর্যন্ত বিলম্ব করাকে বৈধ করেছেন। উল্লেখ্য যে, বাই' সালামে ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য খিয়ারের শর্ত থাকবে না। যদিও অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি করার পর তিন দিনের মধ্যে তা চূড়ান্ত করার ইখতিয়ার দেয়ার শর্ত আরোপ করা বৈধ।[৩৪]

বাই' সালামের ক'টি শরয়ী দিক

মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ী দিকসমূহ :[৩৫]

১. পণ্য অথবা সেবাকে মূল্য হিসেবে গণ্য করা জায়িয। যেমন, গম ও অনুরূপ দানাদার শস্য অথবা পশু-পাখিকে বাই' সালামের মূল্য হিসেবে গণ্য করা যাবে। অনুরূপভাবে নির্ধারিত সময়ের জন্য ভাড়াযোগ্য বাসা ব্যবহার কিংবা বিমান বা জাহাজ ভ্রমণ ইত্যাদি সেবাও বাই' সালামের ক্ষেত্রে মূল্য হতে পারে।
২. ঋণকে পণ্যের মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা বৈধ হবে না। সে ঋণ নগদ অর্থেই হোক কিংবা লেনদেনের কারণে সৃষ্ট হোক।
৩. পরিমাণযোগ্য, পরিমাপযোগ্য ও গণনাযোগ্য ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে বাই' সালাম করা জায়িয।
৪. বাই' সালামে বিক্রির জন্য কারো মালিকানাধীন কোন পণ্যকে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। যেমন, বিক্রেতা কারো মালিকানাধীন কোন গাড়ি দেখিয়ে বললেন যে, এই গাড়ি বাই' সালামে বিক্রি করা হবে। এরূপ নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। তবে গাড়িতে বাই' সালাম করার ক্ষেত্রে গাড়ির ধরন, বিবরণ ও ব্রান্ডের নাম ইত্যাদি উল্লেখ করা জরুরী।
৫. কোন নির্দিষ্ট গাছের বা ভূমির ফসলকে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পণ্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়াই বিক্রেতার দায়িত্ব। তা যেখান থেকে হোক না কেন।

---

৩২. আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৪

৩৩. ইমাম মালিক, *মুয়াত্তা*, কিতাবুল বুয়ু'

৩৪. ড. আলী আহমদ আস্-সালূস, *ফিকহুল বাই' ওয়াল ইসতিসাক ওয়াত তাত্ববিকিল মু'আছির*, দারুস সাক্বাফাহ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৪২৭

৩৫. Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (AAOIFI) শরী'আহ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০, মে ২০০২, পৃ. ১৭০-১৭১

৬. পণ্যটি নগদ অর্থ, স্বর্ণ অথবা রৌপ্য হওয়া বৈধ নয়, যদি মূল্য অনুরূপ নগদ অর্থ, স্বর্ণ অথবা রৌপ্য হয়।

৭. বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ক্রেতার দখলে আসার পূর্বে ক্রেতা তা অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে না।

৮. পণ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা স্বরূপ বিক্রেতার নিকট থেকে বন্ধক, গ্যারান্টি অথবা এ জাতীয় যে কোন বৈধ দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্যের পরিবর্তে বিকল্প পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন।

১০. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত সাপেক্ষে বিক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে (চুক্তিটি বাতিল করা যাবে)। অনুরূপভাবে মূল্য আংশিক ফেরতসাপেক্ষে আংশিক পণ্য সরবরাহ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া যাবে।

১১. চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে বিক্রেতা যেমন পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য ঠিক তেমনি ক্রেতা গ্রহণ করতে বাধ্য।

১২. উল্লিখিত পণ্যের নির্দিষ্ট মানই ক্রেতার লক্ষ্য না হলে উল্লিখিত পণ্যের চেয়ে ভাল মানের পণ্য বিক্রেতা সরবরাহ করলে ক্রেতার জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক। তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য দাবি করতে পারবে না।

১৩. বর্ণনা ও পরিমাণ অনুযায়ী হলে নির্ধারিত মেয়াদের আগে পণ্য সরবরাহ করা বৈধ। তবে তা গ্রহণ করতে ক্রেতাকে বাধ্য করা যাবে না।

১৪. অসচ্ছলতার কারণে ক্রেতা পণ্য সরবরাহ না করতে পারলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে।

১৫. গ্রাহক চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে বাই' সালামের মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে, যেদিন থেকে গ্রাহক উক্ত মালামালের অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করেছে সেদিন থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা জায়িয হবে না। তবে মালামাল নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট স্থানে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে সরবরাহের তারিখ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেতে পারে।

১৬. বাজারে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পণ্য পাওয়া না পাওয়ার কারণে বিক্রেতা নির্দিষ্ট পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম না হলে নিম্নের যে কোন একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ক্রেতার থাকবে :

ক. বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা;

খ. চুক্তি ভঙ্গ করা ও মূল্য ফেরত নেয়া;

গ. অথবা চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্য বদল করে অন্য পণ্য গ্রহণ করা।

১.৪ মুশারাকা (অংশীদারি ব্যবসা-বাণিজ্য) (المشاركة)

মুশারাকা শব্দটি আরবি শির্‌ক শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। শির্‌ক হচ্ছে অংশীদারিত্ব।[৩৬] অংশীদারিত্ব বুঝাতে আরবি ভাষায় শির্‌ক ও শির্‌কাত শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়। অংশীদারিত্ব দু'ধরনের হতে পারে :

ক. শারিকাতুল মিল্‌ক (شركة الملك)

শারিকাতুল মিল্‌ক বা যৌথ মালিকানা দু'ভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে কোন সম্পদের ওপর একাধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা অর্জন। যেমন-কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদের ওপর উত্তরাধিকারীদের যৌথ মালিকানা অর্জিত হয়। অপরটি হচ্ছে ঐচ্ছিকভাবে যৌথ মালিকানা অর্জন। যেমন- দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে কোন সম্পদ হেবা বা উপহার হিসেবে গ্রহণ করা ইত্যাদি।

শারিকাতুল মিল্‌কের বিধান হচ্ছে, সম্পদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হলে তা মালিকানা স্বত্ব অনুপাতে মালিকগণকে বহন করতে হবে। আর সম্পদ থেকে কোন আয় হলে মালিকানা স্বত্ব অনুপাতে অথবা পূর্ব চুক্তি মোতাবেক তা মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হবে। সকল মালিকের অনুমতি ব্যতীত এককভাবে কেউ সম্পদ ব্যবহার, বিক্রি বা দান করতে পারবে না।[৩৭]

খ. শারিকাতুল 'আক্বদ (شركة العقد)

যেখানে চুক্তির অধীনে একাধিক অংশীদার ব্যবসা পরিচালনার জন্য একত্রিত হয়। মুশারাকা বলতে সাধারণত এ প্রকার ব্যবসাকে বোঝানো হয়। এটা আবার চার প্রকার :

১. **শারিকাতুল মুফাওয়াদা** : ব্যবসায়ে একই ধর্মের অনুসারী অংশীদারদের পুঁজি, ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমতা থাকলে তাকে শারিকাতুল মুফাওয়াদা বা সমতা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলে। ইমাম আবু হানিফা ও মালিক রহ. প্রমুখ এটাকে জায়িয বলেছেন। ইমাম শাফিঈ রা. এটাকে না জায়িয বলেছেন।[৩৮]

২. **শারিকাতুল ইনান** : অসম অংশীদারিত্ব বা স্বাধীন অংশীদারিত্ব। এ ক্ষেত্রে মূলধন, ব্যবস্থাপনা ও লাভে সমান অংশীদারিত্ব বাধ্যতামূলক নয়। চুক্তির অনুপাতে লাভ বণ্টিত হবে। তবে লোকসান হলে তা মূলধনের অনুপাতে অংশীদারদের বহন করতে হবে। এ ব্যবসায় একজন অংশীদারকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া বৈধ।

৩. **শারিকাতুল উজুহ** : এ ধরনের ব্যবসায় একাধিক ব্যক্তি কোন পুঁজি বা মূলধন ব্যতীত তাঁদের সুনাম ও ব্যবসায়ী মহলে তাদের বিশ্বস্ততাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার

---

৩৬. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আর-রাজী, *মুখতারুস সিহাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩৭. আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫

৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮

করে অন্যের নিকট থেকে বাকিতে মালামাল ক্রয়পূর্বক নগদে বিক্রি করার মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে এবং তা থেকে অর্জিত লাভ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয়।

৪. **শারিকাতুল আবদান** : এ পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা পক্ষ তারা নিজেদের শ্রম ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করবে এবং কে কতটুকু শ্রম দিয়েছে তা বিবেচনায় না এনে চুক্তি অনুযায়ী তাদের মাঝে লাভ ভাগ করে নেবে।

উল্লেখ্য যে, অংশীদারদের কেউ যদি কারবারে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন অথবা কার্যাবলি বাস্তবায়নে অংশ নেন, তাহলে এসব কাজের বিপরীতে তাঁর জন্য সকল অংশীদারের সম্মতির ভিত্তিতে লভ্যাংশ নির্ধারণ করা যাবে। এছাড়া মুশারাকার চুক্তিপত্রে এরূপ ধারা সংযুক্ত করা যাবে যে, কোন পক্ষ মুশারাকার নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অপর পক্ষকে জরিমানা আরোপ করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

"অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের ওপর নিশ্চিত জুলুম করে থাকে। একমাত্র ঈমানদার ও সৎকর্মশীলরা এরূপ নয় এবং এদের সংখ্যা কম।"[৩৯] এ আয়াতে আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ অংশীদারদের অংশীদারী কারবারকে অনুমোদন করেছেন।

আবু হুরায়রা রা. রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, দু'জন অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয়জন হিসেবে ততক্ষণ অবস্থান করি যতক্ষণ তারা একে অন্যের প্রতি খিয়ানত না করে। তাদের মধ্যে থেকে কেউ তার সঙ্গীর সাথে খিয়ানত করলে আমি তাদের মধ্যে থেকে বের হয়ে যাই।"[৪০]

১.৫ মুদারাবা (المضاربة)

মুদারাবা হচ্ছে মুনাফার ক্ষেত্রে এমন অংশীদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (মূলধনের মালিক) মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ (উদোক্তা) শ্রম দেয়।[৪১]

সালিহ ইবন সুহাইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন-"তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত আছে। বাকিতে বিক্রি, মুকারাদাহ (মুদারাবা) এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়, বরং ঘরে খাওয়ার উদ্দেশ্যে যবের সঙ্গে গম মেশানো।"[৪২]

---

৩৯. আল-কুরআন, ৩৮ : ২৪

৪০. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ফিশ-শারিকাহ, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ২৬৪, হাদীস নং-৩৩৮৫; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف) মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু আবি দাউদ*, হাদীস নং-৩৩৮৩
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ».

৪১. Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (AAOIFI) শরী'আহ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩ (৩/২/১০), মে ২০০২, পৃ. ২৩৮

৪২. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আশ-শারিকাহ ওয়াল মুযারাবাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬৮, হাদীস নং-২২৮৯; হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল (ضعيف جدا); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু ইবনি মাজাহ*, হাদীস নং-২২৮৯

মুদারাবা আবার দু'প্রকার :

ক. মুদারাবা মুতলাকা বা শর্তহীন মুদারাবা। অর্থাৎ মালিক কেবল লাভের নির্দিষ্ট হারের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাকে মূলধন সমর্পণ করবে; মূলধন কোথায়, কোন সময়, কী কাজে এবং কাদের মধ্যে বিনিয়োগ করবে- ইত্যাকার কোনো শর্ত আরোপ করবে না।

খ. মুদারাবা মুকাইয়াদাহ বা শর্তযুক্ত মুদারাবা। অর্থাৎ মালিক উদ্যোক্তাকে তার মূলধন কোথায়, কোন সময়, কী কাজে এবং কাদের মধ্যে বিনিয়োগ করবে- ইত্যাকার কোন শর্তের ভিত্তিতে সমর্পণ করবে।

ইমাম শাফিঈ ও মালিক রহ.-এর মতে, মুদারাবা সবসময় শর্তহীন হতে হবে। মূলধনের মালিক মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ শর্ত আরোপ করতে পারবেন না।[৪৩]

ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ রহ.-এর মতে, মুদারাবা শর্তহীন হওয়া যেমন জায়িয, তেমনি শর্তযুক্ত হওয়াও জায়িয।[৪৪] কেননা আব্বাস রা. কতৃক শর্তযুক্ত মুদারাবাকে রাসূলুল্লাহ স. অনুমোদন করেছেন।[৪৫]

মুদারাবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো ঃ
মুদারাবা মূলধন নগদ অর্থ হওয়া, মূলধনের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা, চুক্তি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় মূলধনের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদারিবের কাছে সমর্পণ করা এবং তাকে মূলধন ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে। মূলধনের ওপর মালের মালিকের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান থাকলে উক্ত মূলধন দ্বারা মুদারাবা কারবার শুদ্ধ হবে না। মুনাফার হার বা অনুপাত উল্লেখ থাকতে হবে।[৪৬] আর উল্লেখ না থাকলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বণ্টিত হবে। তবে পরবর্তীতে উভয়ের সম্মতিতে লাভ বণ্টনের হার পরিবর্তন করা জায়িয।[৪৭] মুদারিবের জন্য লাভের অংশ ও মজুরীর অংশ একত্র করা জায়িয নয়।[৪৮] কোন একপক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ পাওয়ার শর্ত আরোপপূর্বক চুক্তি করলে সে চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু লাভের নির্দিষ্ট হার পর্যন্ত উভয়ে নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করে নিবে আর উক্ত হারের বেশী লাভ অর্জিত হলে তা কোন একপক্ষের মধ্যে বণ্টিত হবে এ শর্ত আরোপ করা জায়িয।[৪৯] মূলধনকে দুই অংশে

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

৪৩. আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৬
৪৪. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৬
৪৫. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারত , খ. ৩
৪৬. আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৫
৪৭. Accounting & Auditing Organizations for Islamic Financial Institution. (AAOIFI) শরী'আহ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩, মে ২০০২, পৃ. ২৪০
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. প্রাগুক্ত

বিভক্ত করে এক অংশের লাভ নিজের জন্য এবং অপর অংশের লাভ মুদারিবের জন্য ও মালের মালিকের জন্য- এটা জায়িয হবে না।[৫০] মুদারাবার কোন কার্যক্রমে লোকসান হলে অন্যান্য কার্যক্রমের প্রাপ্ত লাভ দ্বারা তা পূরণ করা হবে। চুক্তির মেয়াদ শেষে মোট লাভের ভিত্তিতে প্রকৃত লাভ নির্ণয় করা হবে।[৫১] লোকসান বেশী হলে মোট ক্ষতি মূলধন হতে বাদ দেয়া হবে। তবে মুদারিবের অবহেলা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে কোন ক্ষতি হলে তা তাঁকেই (মুদারিবকে) বহন করতে হবে। আর আয়-ব্যয় সমান হলে মালিক তার মূলধন বুঝে নেবেন। এমতাবস্থায় মুদারিব কিছুই পাবে না। মুদারিব তার কোন সম্পদ ব্যবসার সাথে একীভূত করে ফেললে নিজের সম্পদের দ্বারা ব্যবসায়ের অংশীদার এবং অন্যের সম্পদ দ্বারা মুদারিব বিবেচিত হবেন।[৫২] মালের মালিকের মৃত্যুর পর মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ কারণে মুদারিব উক্ত মূলধন ব্যবহার করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের অনুমতি ছাড়া মুদারিব মূলধন ব্যবহার করলে তিনি গাছিব (غاصب) বা জোরপূর্বক দখলকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং এর দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।[৫৩]

১.৬ ইজারা বিল বাই' তাহ্তা শারিকাতুল মিল্ক (মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া প্রদান)

এটা ইসলামী ব্যাংকগুলোর একটি বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি। এখানে তিনটি পদ্ধতিকে সমন্বয় করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো হলো ঃ

ক. ইজারা

খ. বাই'

গ. শারিকাতুল মিলক।

ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতিটি মুখ্য; বাকি পদ্ধতি দু'টি হচ্ছে আনুষঙ্গিক। ইজারা পদ্ধতির আয়কে বলা হয় ভাড়া। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক কোন সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হন গ্রাহক আর অবশিষ্ট অংশের মালিক হন ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়ার এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাড়াটিয়ার কাছে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বিক্রি করায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বিক্রি এককালীন বা কিস্তিতে হলেও কোন অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ইজারা, বাই', শারিকাতুল মিলক তিনটিই জায়িয। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

---

৫০. প্রাগুক্ত

৫১. প্রাগুক্ত

৫২. প্রাগুক্ত

৫৩. আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৮

"তুমি যাদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত কর তাদের মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোকই উত্তম।"[৫৪] উল্লিখিত আয়াতে শুয়াইব আ. কর্তৃক মূসা আ.-কে শ্রমিক নিযুক্ত করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।"[৫৫]

তিনি আরো বলেন, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"তারা (উত্তরাধিকারীরা) এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে"।[৫৬]

২. ব্যবসার হারাম পদ্ধতিসমূহ

২.১ অপবিত্র বস্তুর ব্যবসা হারাম : অপবিত্র বস্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে যার কোন মূল্য নেই তা হারাম বলে গণ্য হবে। যেমন : মদ, গাজা, শূকর, রক্ত ,মূর্তি, ক্রুশ, প্রতিকৃতি ইত্যাদি হারাম হওয়ার কারণে এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন, বণ্টন, উপার্জন বৈধ নয় তথা হারাম। জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ স.-কে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদ, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন।"[৫৭] "যে বস্তু পান করা হারাম, তা বেচাকেনা করা এবং বেচাকেনার পর এর মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম।"[৫৮] "ইব্ন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স. কে রুকনের নিকট বসা দেখেছি। এরপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠালেন ও হেসে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ ইহুদীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ স. কথাটি তিনবার বললেন।) আল্লাহ তাদের জন্য চর্বিকে হারাম

---

৫৪. আল-কুরআন, ২৮ : ২৬

৫৫. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫

৫৬. আল-কুরআন, ০৪ : ১২

৫৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : বায়উল মায়তাতি ওয়াল আসনাম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৭৯, হাদীস নং-২১২১

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ

৫৮. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৩, হাদীস নং-২১৯০; হাদীসটির সনদ হাসান (حسن)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّاتِهَا الْخَمْرُ فَقَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ أَهْدَاهَا لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ فَأَقْبَلَ صَاحِبُ الرَّاوِيَةِ عَلَى إِنْسَانٍ مَعَهُ فَأَمَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمَرْتَهُ قَالَ بِبَيْعِهَا قَالَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَأَكْلَ ثَمَنِهَا قَالَ فَأَمَرَ بِالْمَزَادَةِ فَأُهْرِيقَتْ

করেছেন। অতঃপর তারা তা বিক্রি করলো ও এর মূল্য খেল। আল্লাহ্ যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন।"[৫৯]

ইব্‌নু উমর র. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন- "আল্লাহ্ তাআলা লা'নত করেন। মদের ওপর, মদ্যপায়ীর ওপর, মদ পরিবেশনকারীর ওপর, ক্রয়-বিক্রয়কারীর ওপর, প্রস্তুতকারীর ওপর, বহনকারীর ওপর এবং যার জন্য বহন করে আনা হয় তার ওপর।"[৬০]

ফকীহগণের মতে, মুসলিম দেশে হারাম বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করা জায়িয নেই। এমনকি প্রকাশ্য হলে অমুসলিমদের জন্যও নয়।[৬১] এছাড়া ক্ষতিকর জন্তু ও পাখি যেমন-কুকুর, বাঘ, সিংহ, কাক, পেঁচা ইত্যাদি বিক্রিও সাধারণভাবে অবৈধ।[৬২] কেননা এসব জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা যদি জায়িয করে দেয়া হতো, তাহলে সমাজে গুনাহের কাজ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করত।

২.২ অস্তিত্বহীন, হস্তান্তর অযোগ্য এবং অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় : যে বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই তা বিক্রি করা বৈধ নয়। যেমন-উট, গরু অথবা ছাগলের গর্ভজাত বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করা।[৬৩] যে পণ্য হস্তান্তর করা যায় না এবং হস্তগত হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা আছে তার বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে।[৬৪] যেমন-উড়ন্ত পাখি ও পানির মাছ। অনুরূপভাবে ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফলমূল পাকা ও খাবার উপযোগী হবার পূর্বে বিক্রি করাও জায়িয নয়। কেননা প্রাকৃতিক কারণে ফসল বিনষ্ট হলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স.

---

৫৯. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইজারা, অনুচ্ছেদ : ফী ছামানিল খামরি ওয়াল মায়তাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯৮, হাদীস নং-৩৪৯০; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু আবি দাউদ*, হাদীস নং-৩৪৮৮

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ - قَالَ - فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ». ثَلاَثًا « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ».

৬০. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আশরিয়াহ, অনুচ্ছেদ : আল-ইনাবু ইউ'সরু লিল-খমরি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৬, হাদীস নং-৩৬৭৬; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু আবু দাউদ*, হাদীস নং-৩৬৭৪

ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ».

৬১. আব্দুর রহমান আল-জাযায়িরী, *আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ*, মিসর : দারুল গদীল জাদীদ, ১ম সংস্করণ, ২০০৫, পৃ. ৫৩৬-৫৩৭

৬২. প্রাগুক্ত

৬৩. প্রাগুক্ত

৬৪. আব্দুর রহমান আল-জাযায়িরী, *আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯

বলেছেন : "আনাস ইব্‌নু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. ফল পাকার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ স.-কে প্রশ্ন করা হলো, ফল পেকেছে এটা কীভাবে বুঝবো? তিনি বললেন : যখন লাল হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার কী অভিমত, আল্লাহ যখন ফল বাধাপ্রাপ্ত করে দেবেন, তখন তোমার ভাইয়ের টাকা নেয়া তোমাদের জন্যে কিভাবে জায়িয হতে পারে?"[৬৫]

২.৩ বায়নার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় : এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যেখানে ক্রেতা কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য বিক্রেতাকে বায়না বা অগ্রিম মূল্য প্রদান করে এ শর্তে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে বাকি মূল্য দিয়ে উক্ত মাল ক্রয় করে নিবে। যদি ক্রেতা উক্ত মাল ক্রয় না করে তাহলে তার দেয়া বায়না বা অগ্রিম মূল্য আর ফেরত পাবে না এবং তা বিক্রেতার কাছে দান হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে অধিকাংশ ফকীহ বাতিল বলেছেন।

২.৪ পানি বিক্রি করা : নদ-নদী সমুদ্রের পানি সর্বসম্মতভাবে বিক্রি করা জায়িয না।[৬৬] কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা পানি যেমন- ওয়াসার পানি, মিনারেল ওয়াটার ইত্যাদি বিক্রি করা যাবে। তবে প্রাণ রক্ষার জন্য সব ধরনের পানি বিনা মূল্যে প্রদান করা ওয়াজিব।

২.৫ সুদী ব্যবসা হারাম : সুদকে আরবী ভাষায় রিবা বলে। রিবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, স্ফীতি বা বাড়তি।[৬৭] পারিভাষিক অর্থে - সম্পদে একটা বিশেষ ধরনের বৃদ্ধির নাম হচ্ছে রিবা বা সুদ। প্রচলিত অর্থে রিবা হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ পরিশোধের সময় অতিরিক্ত বিনিময় আদায় করে থাকে। "রিবা হচ্ছে এমন বাড়তির নাম যা কোন মালের বিনিময় নয়।" মালের ওপর

---

৬৫. ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা,* অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : আন-নাহী আন বাইয়িস ছিমারি হাত্তা ইয়াবদাউ সালাহুহা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ : حِينَ تَحْمَرُّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ »

৬৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-ইজাজ, অনুচ্ছেদ : ফী বায়ঈ ফাযলিল মা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯৬, হাদীস নং-৩৪৮০; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু আবু দাউদ,* হাদীস নং-৩৪৭৮

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ »

৬৭. ইবরাহীম মাদকুর, *আল মু'জামুল ওয়াসীত* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

যে অতিরিক্ত দাবি করা হয় তার নাম রিবা।"[৬৮] ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ শুধু মহাজনী কারবারের ক্ষেত্রেই নয়; বরং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সমভাবে হারাম। আরবে সুদখোরী ব্যবসা ছিল একটি সাধারণ পেশা। সুদখোর মহাজনরা দাবি করতো, সুদ এক ধরনের লেনদেন ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ্ তাদের এ কথা খণ্ডন করে বলেছেন,

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত ;কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[৬৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে নিম্নের দু'টি নীতি লঙ্ঘিত হলে তা সুদ হিসেবে পরিগণিত হবে। নীতি দু'টি হল-

১. সমজাতীয় পণ্যের বেচাকেনার ক্ষেত্রে ভাল-খারাপ ও কম দামী-বেশী দামী ইত্যাদি বিবেচনা ব্যতীত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের পণ্য সমান ওজনের হতে হবে। কম-বেশী করা যাবে না। তাৎক্ষণিক বিনিময় করতে হবে। ধারে বা বাকিতে করা যাবে না। যেমন-সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবনের বিনিময়ে লবন প্রভৃতি সমজাতীয় হতে হবে। কম-বেশী করলে তা সুদ হয়ে যাবে।

২. ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য সমজাতীয় না হলে, তাতে কম-বেশী করা যাবে। যেমন-সোনার বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে খেজুর, লবনের বিনিময়ে গম প্রভৃতি লেনদেনে কম-বেশী করা যাবে। তবে এ জাতীয় পণ্যের বেচাকেনা নগদ করতে হবে। ধারে বা বাকিতে করা যাবে না। এ দু'টি নীতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিম্নোক্ত সহীহ হাদীসটিকে ফকীহগণ মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন। উবাদাহ ইব্নুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন- "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবনের বিনিময়ে লবন সমপরিমাণ এবং হাতে হাতে তাৎক্ষণিক ও নগদ হতে হবে। আর পণ্য সমজাতীয় না হলে যেভাবে খুশী কম-বেশী করা যাবে। তবে বাকিতে করা যাবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে লেনদেন করতে হবে।[৭০]

---

৬৮. ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, *আত-তাফসীর আল-কাবীর*, বৈরুত : দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছিল আরাবী, তা. বি., পৃ. ২৬০

৬৯. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

৭০. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : আস-সারফু ওয়া বায়উস যাহাবি বিলওরাকি নাকদান, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৪৪, হাদীস নং-৪১৪৭

মুসলিম ফকীহগণ উপর্যুক্ত হাদীসটিকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদ হওয়া না হওয়া নির্ধারণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ হাদীসে বর্ণিত শর্তাবলীর পরিপন্থী হলে তারা তাকে সুদ হিসেবে অভিহিত করেন। বাংলাদেশে প্রচলিত সাধারণ ব্যাংক, বীমা, ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংক, বীমা, ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে এ নীতিটিই পার্থক্য নির্ণয় করে। সাধারণ ব্যাংকিং-এ টাকার বিনিময় টাকার লেনদেন কম-বেশী করা হয় বলে আলোচ্য হাদীসের আলোকে তা সুদে পরিণত হয়। আর ইসলামী ব্যাংকিং-এ মালামালের বিনিময়ে টাকার লেনদেন করা হয় বলে তাতে কম-বেশী করা হলেও তা সুদে পরিণত হয় না। সুদের পরিমাণ কম হোক বেশি হোক- সবই হারাম।

আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের অবশিষ্টাংশ পরিহার কর যদি তোমরা ঈমানদার হও।"[৭১]

সুদ সমাজ জীবনের ওপর এক ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে। হাদীসে সুদের সাথে জড়িত সকলকে অপরাধী গণ্য করে বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "সুদদাতা, গ্রহীতা, সাক্ষী এবং লেখক, তাদের সকলের ওপর আল্লাহ্ তাআলা অভিশাপ করেছেন।"[৭২]

২.৬ মিথ্যা, প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া ও ভেজাল মিশানো : পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেওয়া কিংবা ওজন করে নেওয়ার সময় বেশী করে নেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পুরো মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।"[৭৩]

---

৭১. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮

৭২. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় : মুসনাদুল মুকছিরীনা মিনাস সাহাবাহ, অনুচ্ছেদ : মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনি মাসউদ রা., প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৫৮, হাদীস নং-৩৮০৯; হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহী (صحيح لغيره); তবে এই সনদটিতে বর্ণনাকরী শারীক (شريك) থাকার কারণে এটি যঈফ (ضعيف)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

৭৩. আল-কুরআন, ৮৩ : ১-৩

মিকদাম ইব্ন মা'দীকারাব থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন, তোমরা তোমাদের খাদ্য-দ্রব্য ওজন করবে, তাহলে তোমাদের জন্য বরকত ও কল্যাণ দান করা হবে।"[৭৪]

বেচাকেনার ক্ষেত্রে প্রতারণা করা, পণ্যদ্রব্যের পরিচয় দান কিংবা গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা উক্তি করা কিংবা ভুল প্রচারণা করা বা মালে ভেজাল মিশানো হারাম। যেমন- বিজ্ঞাপনের সময় কোন বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করা। কেননা এতে ক্রেতাকে প্রতারিত করা হয়। অধিক মূল্য লাভের উদ্দেশ্যে পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রেখে তা বিক্রয় করা হারাম। ইব্নু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, "বাজারে পৌছার পূর্বে (স্বল্পে মূল্যে) ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সাক্ষাৎ করবে না। পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না এবং কেউ অন্যের পণ্য চালানোর জন্য প্রতারণার অপচেষ্টা করবে না।"[৭৫]

ক্রয়ের উদ্দেশে নয়; বরং কেবলমাত্র মূল্য বাড়াবার জন্য দর-দাম করা জায়িয নয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।"[৭৬] এরূপ করাও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

২.৭ মূল্য নিয়ন্ত্রণ : ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। হাট-বাজার স্বাভাবিকভাবে চলতে পারলে দ্রব্যমূল্য নিজ থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা.-এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন নবী স. বললেন, "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই। তিনিই মূল্যবৃদ্ধি করেন, তিনি সস্তা করেন। রিযকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে

---

৭৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মা ইউসতাহাব্বু মিনাল কায়ল, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৪৯, হাদীস নং-২০২১
عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ.

৭৫. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : বায়উল মুহাফ্ফালাত, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্য, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ৫৬৮, হাদীস নং-১২৬৮; হাদীসটির সনদ হাসান (حسن)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلاَ تُحَفِّلُوا وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ».

৭৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : ফিন-নাহয়ি আনিন নাজাশ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮২, হাদীস নং-৩৪৪০; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু আবু দাউদ,* হাদীস নং-৩৪৩৮
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَنَاجَشُوا ».

চাই এ অবস্থায় যে, তোমাদের কারো রক্ত বা ধন-সম্পদের ব্যাপারে কোনরূপ অন্যায়-অবিচারের দাবি আমার ওপর থাকবে না।"[৭৭]

কিন্তু বাজারদরের ওপর যদি অস্বাভাবিক চাপ আসে, যেমন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদকরণ শুরু হয়ে যায় এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ে খেলা করে, তাহলে সমষ্টির কল্যাণ স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হবে। তখন সেই সমষ্টির কল্যাণার্থে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া শুধু জায়িযই নয়, বরং ওয়াজিব।[৭৮]

২.৮ গুদামজাত করা : মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আটকিয়ে রেখে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা জায়িয নেই। মুয়াম্মার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।।"[৭৯] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, "ইব্নু উমার র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (মূল্য বাড়ার উদ্দেশ্যে) যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখে, সে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আল্লাহও তার থেকে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তার ওপর অসন্তুষ্ট।"[৮০] "মজুদদার ব্যক্তি খুবই নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। যদি জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পায় তবে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে। আর যদি দর বেড়ে যায়, তবে আনন্দিত হয়।"[৮১] উমর ইব্নুল খাত্তাব রা.

---

৭৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : ফিত-তা'সীর, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.২৮৬দ হাদীস নং-৩৪৫৩; হাদীসটির সনদ সহীহ, (صحيح), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু আবু দাউদ*, হাদীস নং-৩৪৫১
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ ».

৭৮. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনূ. আব্দুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৬শ সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৩৫৩

৭৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাহ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমুল ইহতিকার ফিল-আকওয়াত, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-৪২০৬
أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ »

৮০. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় ; মুসনাদুল মুকছিরীনা মিনাস-সাহাবাহ, অনুচ্ছেদ : মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনি উমার ইবনিল খাত্তাব রা., প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৮১, হাদীস নং-৪৮৮০; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف) মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলেছেন; *যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, খ. ১, পৃ. ২৭৫, হাদীস নং-১১০০
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ

৮১. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, অনুচ্ছেদ : মুআয ইবনু জাবাল আল-আনসারী ..., মুসেল : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি., খ. ২০, পৃ. ৯৫, হাদীস নং-১৬৯৪৩; হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল (ضعيف جدا); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিয-*

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, "কেউ যদি মুসলিমদের থেকে তার খাদ্যশস্য আটকিয়ে রাখে, তবে আল্লাহ্ তাআলা তার ওপর মহামারী ও দরিদ্রতা চাপিয়ে দেন।"[৮২] ফকীহগণ দু'টি শর্তে মজুদকরণ হারাম করেছেন। এক. জনগণের দুর্ভোগ ও অসুবিধা বৃদ্ধি পাওয়া, দুই. অধিক মূল্য লাভ করা। বিশেষত আমাদের দেশে রমযান মাসে চিনি ও ছোলা, চাষাবাদের মওসুমে সার, কোরবানীর সময় মসলা ও তৈল, এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে গুদামজাতকরণের মাধ্যমে আলু, পিয়াজ, রসূন, চাল ও ডাল ইত্যাদির কৃত্রিম সংকট তৈরীর মাধ্যমে ব্যবসা সম্পূর্ণ হারাম।

২.৯ চোরাই জিনিসের বেচা-কেনা হারাম : ইসলাম অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা জেনে শুনে ক্রয় করা হারাম। কেননা তা করা হলে অপহরণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করলো, সে তার অন্যায় কাজে ও গুনাহে শরীক হয়ে গেল।"[৮৩] চুরি করা মালের ওপর যদি দীর্ঘদিনও অতিবাহিত হয়, তাহলেও তার গুনাহ দূর হয়ে যায় না। কেননা ইসলামে সময়ের দীর্ঘতা হারামকে হালাল করে দেয় না। প্রকৃত মালিকের হক নাকচ করে না।[৮৪]

যঈফই ওয়াল মাওযূসুআহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি-ই ফিল উম্মাহ, রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি. খ. ১২, পৃ. ১৩০, হাদীস নং-৫৫৬৭

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الاحْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ:"إِذَا سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ، وَإِذَا سَمِعَ بِغَلاءٍ فَرِحَ بِهِ، بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الأَسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغْلاهَا اللَّهُ فَرِحَ"

৮২. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আল-হিকরাতু ওয়াল জালব, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭২৯, হাদীস নং-২১৫৫; হাদীসটির সনদ হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকলানী হাসান (حسن) বললেও (ফাতহুল বারী, বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি., খ. ৪, পৃ. ৩৪৮) আল-আলবানী হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف) বলেছেন; *সহীহ ওয়া যঈফ আল-জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু,* বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তা.বি., হাদীস নং-১২১৩০

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاس.

৮৩. ইমাম হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১, হাদীস নং-২২৫৩; মুসতাফা আব্দুল কাদির আতা হাদীসটিকে সহীহ (صحيح) বলেছেন কিন্তু মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসটির সনদকে যঈফ (ضعيف) বলেছেন। *সহীহ ওয়া যঈফ আল-জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২১৯৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ :« مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شَرِكَ فِى عَارِهَا وَإِثْمِهَا ».

৮৪. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

২.১০ কসম করে বিক্রি করা : ধোঁকাবাজির সাথে মিথ্যামিথ্যি কসম বা শপথ করা হলে এ কাজ অধিক মাত্রায় হারাম হয়ে যায়। নবী স. ব্যবসায়ীদের কসম বা শপথ করতে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে মিথ্যা কসম বা শপথ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছেন, "কসম পণ্যদ্রব্যকে চালু করে বটে; কিন্তু উপার্জনকে বরকতশূন্য করে দেয়।"[৮৫] কেননা এখানে ধোঁকাবাজি ও আল্লাহর পবিত্র নামের ইজ্জত নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে।

২.১১ অনৈতিকভাবে আয়-রোজগার : অনৈতিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য জায়িয নেই। যেমন : অশ্লীল গান-বাজনা, অশ্লীল সিনেমা, অশ্লীল থিয়েটার, সার্কাস, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, পার্ক এবং হোটেলে অনৈতিক কাজের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি। আবু উমামা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "গায়িকা দাসী বিক্রি করবে না এবং কিনবেও না। তাদের গান শিক্ষা দিবে না। এদের ব্যবসায় কোন কল্যাণ নেই। এদের মূল্য ভক্ষণ করা হারাম। এদের মত লোকদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে : "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওরা তারাই যাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।"[৮৬] উল্লেখ্য যে, গান, কবিতা, থিয়েটার যদি শরীয়ত সম্মত হয় তাহলে তার মাধ্যমে অর্থোপার্জন করা বা ব্যবসা করা যাবে।

২.১২ মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে বেচাকেনা : ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মতে- স্থাবর সম্পত্তি হস্তগত হওয়ার পূর্বেই বিক্রি জায়িয। তবে অস্থাবর সম্পদ হস্ত গত হওয়ার পূর্বে বেচা-কেনা করা জায়িয নয়। অবশ্য এই হস্তগত হওয়ারও ব্যাখ্যা আছে। হস্তগত হওয়ার অর্থ হলো, নিজের প্রাপ্য সুনির্ধারিত হয়ে যাওয়া। তাই মালের প্রকৃতির ব্যবধানে এই হস্তগত হওয়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ব্যবধান ঘটবে। মাল যদি সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা হয়, তবে তা সরাসরি হস্তগত হওয়ার দ্বারাই নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে যদি চাল, ডাল, গম ইত্যাদি বস্তু হয় তাহলে লেন-দেনের সময় ক্রেতার অংশটা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেই তার অংশ নির্ধারিত হয়ে যায় । তারপর ইচ্ছা করলে সে বেচা-বিক্রিও করতে পারে।[৮৭]

---

৮৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আস-সুহুলাহ ওয়াস সামাহাহ ফিশ-শিরাই ওয়াল বায়,..., প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৩৫, হাদীস নং-১৯৮১
إنّ أبا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول : الْحَلِف مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

৮৬. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় ; আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : কারাহিয়্যাতু বায়উল মুগান্নিয়্যাত, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৭৯, হাদীস নং-১২৮২; হাদীসটির সনদ হাসান (حسن)
عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لاَ تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِى تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِى مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه) إِلَى آخِرِ الآيَةِ »

৮৭. আব্দুর রহমান আল-জাযায়িরী, *আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৮

২.১৩ বাজারের স্বাধীনতায় কৃত্রিম হস্তক্ষেপ : শহরবাসীর গ্রামবাসীর কাছ থেকে মাল ক্রয় করে নেওয়া। তার রূপটা হচ্ছে, গ্রামের লোক মাল নিয়ে শহরের বাজারে এলো চলতি দামে বিক্রয় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শহরের লোক বলল : এ মাল আমার কাছে রেখে যাও, পরে বেশি দামে বিক্রি করে তোমাকে মূল্য ফেরত দেব। এমতাবস্থায় গ্রাম থেকে আসা লোকটি যদি নিজে মাল বিক্রি করত তাহলে তা সস্তায় বিক্রি হতো। তাতে সে নিজেও মুনাফা লাভ করত এবং ক্রেতারাও লাভবান হতো। সামষ্টিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাসূল স. বলেছেন, "কোন শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করে– এ বিষয়ে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। সে লোক তার নিজের ভাই অথবা পিতা হোক না কেন।"[৮৮]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে : "জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন, কোন শহরের লোক যেন গ্রামের লোকের পণ্য বিক্রি না করে। তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের একজনের দ্বারা অপরের রিয্ক দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।"[৮৯]

২.১৪ ছাদেরর উপরে শূন্যস্থান বিক্রয় : বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে, ঘনবসতির কারণে ছাদের ওপরের শূন্যস্থান বিক্রির একটা প্রথা চালু হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই বিক্রয় সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ ক্রয়-বিক্রয় হালাল হওয়ার জন্য মূল্যের বিপরীতে একটি সম্পত্তি থাকতে হয়। ভিন্ন ভাষায় বিক্রিত বস্তুটি মাল হতে হয়। আর মাল এমন বস্তুকে বলা হয় যা কব্জা করা যায় এবং যার সংরক্ষণ সম্ভব। পক্ষান্তরে ছাদের উপরের শূন্যস্থানের সম্পর্ক বাতাসের সাথে, ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে এক শূন্যস্থানে। যা বিক্রিত বস্তু হওয়ার যোগ্য নয়। তাই এর বিক্রিও বৈধ নয়।[৯০] হ্যাঁ, যদি কোন বিল্ডিং বহুতলা বিশিষ্ট হয়; তবে উপরের তলা, নীচ তলা আলাদা আলাদা বিক্রি করা যেতে পারে। কারণ, বিল্ডিং এর উপরের তলা বিক্রিযোগ্য, কব্জা ও সংরক্ষণযোগ্য বস্তু।[৯১]

---

৮৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমু বায়ইল হাযিরি লিল-বাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬, হাদীস নং-৩৯০৪

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

৮৯. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় ; আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন-লা-ইয়াবি' হাযিরু লি-বাদি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৩৪, হাদীস নং-২১৭৬। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); দেখুন, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু ইবনু মাজাহ*, হাদীস নং-২১৭৬

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

৯০. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০

৯১. প্রাগুক্ত

ছাদের উপরের শূন্যস্থান বিক্রি অবৈধ হওয়ার কারণ হলো, সাধারণত এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় অনর্থক ঝগড়ার সৃষ্টি করে। একই কারণে ঘর-বাড়ি ছাড়া শুধু শূন্যস্থান বিক্রিও অবৈধ। যেমন- একজনের কাছে দশফুট উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত বিক্রি করা হলো আরেকজনের কাছে দশফুট থেকে বিশফুট উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত বিক্রি করা হলো।

২.১৫ বাই' ফাসিদ : যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগতভাবে শরীয়তসম্মত; কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে শরীয়ত সম্মত নয়, তাকে বাই' ফাসিদ[৯২] বলে। যেমন-অনেক গাড়ী থেকে নির্দিষ্ট না করে কোন একটি গাড়ী বিক্রি অথবা অনেক ঘর থেকে একটি ঘর বিক্রি করা। অনেক গাড়ী থেকে নির্দিষ্ট না করে কোন একটি গাড়ী বিক্রি করা হলে কাঙ্খিত গাড়িটি নির্ধারণে উভয়ের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দিলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। বাই' ফাসিদে মালামাল ক্রেতার হস্তগত হলে তিনি তার মালিক হবেন এবং ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কার্যকর হবে। বাই' ফাসিদের অধীনে ক্রেতার হস্তগত অবস্থায় মালামাল ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। বাই' ফাসিদ এর প্রকার :

১. **অজ্ঞাত বস্তু বিক্রি করা :** পণ্য অথবা মূল্যের কোন একটি অজ্ঞাত থাকলে তা ক্রয়-বিক্রয় করা বাই' ফাসিদ হবে। কেননা এ ধরনের অজ্ঞতা পণ্যটি সমর্পণ ও মূল্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[৯৩]

২. **শর্তযুক্ত বিক্রি :** শর্তসাপেক্ষে কোন পণ্য বিক্রি করা বাই' ফাসিদ। যেমন-কোন ক্রেতা বিক্রেতাকে প্রস্তাব করলেন, আমি আপনার কাছে এ বাড়িটি এ মূল্যে বিক্রি করলাম, যদি অমুক ব্যক্তি তার বাড়িটি আমার কাছে বিক্রি করে। অনুরূপভাবে ভবিষ্যত সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করে বিক্রি করাও বাই' ফাসিদ।[৯৪] যেমন-কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে বললো, আমি আগামী মাসে আপনার কাছে এই গাড়িটি এত মূল্যে বিক্রি করলাম।

৩. **অদৃশ্য বস্তু বিক্রি :** অদৃশ্য বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ। কেউ কোন অদৃশ্য বস্তু ক্রয় করলে ক্রেতা কর্তৃক তা দেখার পর বাই সম্পাদনের ব্যাপারে ক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে।[৯৫] তবে মোড়কে আবৃত খাদ্য-দ্রব্য, ঔষধ ইত্যাদি না দেখেই ক্রয় করা বৈধ। কেননা তাতে প্রতারণার আশঙ্কা কম।

---

৯২. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বাই' বাতিল ও বাই' ফাসিদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, এছাড়া সকল ইমামদের মতে- এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য নেই। আব্দুর রহমান আল-জাযায়িরী, *আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩

৯৩. প্রাগুক্ত

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪

৪. **বাই' ব্যাক :** কোন ব্যক্তি তার পণ্যটি অন্যের কাছে বাকিতে বিক্রির পর আবার ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে তা নগদে ক্রয় করে নেয়াকে বাই' ঈনা বা বাই' ব্যাক বলে। এটি বাই' ফাসিদের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে পাঁচ হাজার টাকায় একশো ছাতা এক বছর পর মূল্য গ্রহণের শর্তে বিক্রি করলেন। অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে চার হাজার টাকা নগদ মূল্যে উক্ত ছাতা ক্রয় করে নিলেন। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে বাই' এর সকল উপাদান পাওয়া গেলেও কৌশলে সুদ গ্রহণের আশঙ্কা থাকায় বৈধ নয়।[৯৬]

৫. **এক বিক্রির ভিতর দুই বিক্রি অথবা বিক্রয়ে দু'টি শর্ত আরোপ করে ক্রয়-বিক্রয় করা :** এক বিক্রির ভিতর দুই বিক্রি অথবা বিক্রয়ে দু'টি শর্ত আরোপ করে ক্রয়-বিক্রয় করা বাই' ফাসিদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোন বিক্রেতা বললো- আমি এই জিনিসটি আপনার কাছে নগদে হলে এক হাজার টাকায়, আর বাকিতে হলে একহাজার পাঁচশত টাকায় বিক্রি করলাম। অথবা এভাবে শর্তযুক্ত করলো, আমি আপনার নিকট আমার ঘরটি এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, আপনি আপনার ঘরটি আমার কাছে আবার বিক্রি করবেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী স. এক বিক্রির ভিতর দুই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"[৯৭]

৬. **ফল বা শস্য উৎপন্ন হবার পূর্বে বিক্রি :** কোন নির্দিষ্ট গাছে ফল ধরার পূর্বে অথবা কোন নির্দিষ্ট জমিনে ফসল উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ।[৯৮] কেননা, মহানবী স. অস্তিত্বহীন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ইব্‌নু উমার র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. ব্যবহাররোপযোগী না হলে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কেই তিনি নিষেধ করেছেন।[৯৯] ফলমূল গাছে প্রকাশিত হওয়ার পর খাওয়া

---

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৮

৯৭. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন বায়আতায়নি ফী বায়আহ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩৩; হাদীস নং-১২৩১; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح)

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتَين في بيعة

৯৮. আব্দুর রহমান আল-জাযায়িরী, *আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০-৫৭৪

৯৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন বায়ইছ ছিমারি কবলা বুদুয়্যি সলাহুহা বিগায়রি শরতিল কতঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১, হাদীস নং-৩৯৪১

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

বা ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে বিক্রি করলে যদি এই শর্ত করা হয় যে, ক্রেতা কেনার সাথে সাথে কেটে নিয়ে যাবে, গাছে ঝুলিয়ে রাখবে না। তবে তা সর্বসম্মতভাবে জায়িয। আর ব্যবহারযোগ্য পর্যন্ত গাছেই থাকবে- এই শর্তে বিক্রি করা সকল ইমামের মতে না-জায়িয। কোনরূপ শর্ত ছাড়া বিক্রি করা ইমাম আবু হানিফার মতে জায়িয। তবে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে সাথে সাথে ক্রেতাকে তা কেটে নিতে বাধ্য করতে পারবে।[১০০]

উপসংহার : ব্যবসা-বাণিজ্যের হালাল-হারাম পদ্ধতিগুলো আলোচনার পর বলা যায় যে, ইসলামে আয়-উপার্জনের যতগুলো মাধ্যম আছে তার মধ্যে নিজের শারীরিক শ্রমলব্ধ আয় এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়কে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যবসা দুনিয়াবী কাজ হলেও যখন একজন মুসলিম মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে সততার সাথে জনকল্যাণ ও জনসেবার লক্ষ্যে ব্যবসা করে তখন তা ইবাদতে পরিণত হয়। আধুনিক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে যে যেভাবে পারছে ব্যবসা করছে। ফলশ্রুতিতে নষ্ট হচ্ছে মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাত। এ অবস্থায় মুসলমানদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের হালাল-হারাম পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং অন্যরা যাতে যেগুলো সম্পর্কে জানতে পারে এজন্য ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা গবেষণা হতে হবে। তবেই এ পরিস্থিতিতে হালাল-হারাম নিয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা সম্ভব।

---

১০০. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩

কাযয়ান) অর্থাৎ শাসন করা, বিচার করা, রায় দেওয়া, আদেশ করা ইত্যাদি।[৩] যেমন আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

"وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"

"তোমাদের পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"[৪]

পারিভাষিক অর্থ

হানাফী ইমামগণ এভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন,

القضاء بأنه (فصل الخصومات وقطع المنازعات وذلك بالحكم بين الناس بالحق كما أنزل الله تعالى وأن يكون ذلك على نحو ملزم صادر عمّن له ولاية عامة وأن يكون بناءً على بينة من المدعي أو إقرار من المدعى عليه)

অর্থাৎ 'কাযা' হলো- বিবাদ নিরসন করা এবং ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করা। এটা আল্লাহ্ তাআলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ন্যায়ানুগভাবে মানুষের মাঝে ফায়সালা করার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় এবং এটা ব্যাপক কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে বাদীর প্রমাণ কিংবা বিবাদীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে নির্ণীত হয়।[৫]

মালিকী ইমামগণের মতে,

القضاء بأنه (إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام وذلك بحق من تعلق به الحكم خاصة، وليس في عموم مصالح المسلمين)

অর্থাৎ 'কাযা' হলো- বাধ্যতামূলক উপায়ে শরয়ী' বিধান সম্পর্কে অবহিতকরণ। আর এ অবহিতকরণ কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত; মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থসমূহের সাথে সম্পৃক্ত নয়।[৬]

শাফিয়ী ইমামগণের মতে,

بأنه فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم الله تعالى على نحو ملزم بناءً على الولاية التي يملكها القاضي

অর্থাৎ 'কাযা হলো- কাযী বা বিচারকের কর্তৃত্ব বলে বাধ্যতামূলক পন্থায় আল্লাহ্ তাআলার বিধান মোতাবেক দুই বা ততোধিক ব্যক্তির বিবাদ মীমাংসা করা।[৭]

---

৩. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আব্দুল কাদির আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, বৈরূত : মাকতাবাতু লুবনান নাশিরুন, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ২২৬

৪. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩

৫. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, *হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, মিসর : শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতবায়াতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী ওয়া আওলাদিহী, ১৯৬৬, খ. ৫, পৃ. ৩৫২

৬. আলী আস-সায়ীদী আল-আদাভী, *হাশিয়াতুল আদাভী আলা শরহে কিফায়াতিত ত্বালিবির রাব্বানী*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১২ হি., খ. ২, পৃ. ১৯৪

হাম্বলী ইমামগণের মতে,

إنه الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات

অর্থাৎ 'কাযা' হলো শরয়ী বিধান বাধ্যতামূলক করে দেওয়া এবং বিবাদ মীমাংসা করা।[৮]

বিচারকার্যের গুরুত্ব

কুরআন ও হাদীসের দ্বারা বিচারকার্যের গুরুত্ব প্রমাণিত। কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।"[৯]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মাঝে ন্যায়ভিত্তিক বিচার-মীমাংসা করতে শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি আরো এরশাদ করেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابَ

"হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।"[১০]

উক্ত আয়াতে হযরত দাউদ আ. কে অভিভাবক হিসেবে তাঁর উম্মতের মাঝে আল্লাহ্ তাআলার বিধান অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা ও বিচার-মীমাংসা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

---

৭. ইমাম মুহাম্মদ আল-খাতীব আশ-শারবীনী, *মুগনি আল মুহতাজ ইলা মারিফাতি মায়ানী আলফাজিল মিনহাজ*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৩৭২

৮. মানসূর ইবনে ইউনুস আল-বুহুতী, *শারহু মুনতাহাল ইরাদাত*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৪৫৯

৯. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

১০. আল-কুরআন, ৩৮ : ২৬

“অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।”[১১]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কসম দিয়ে এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ তখনই পরিপূর্ণ মুমিন হিসেবে গণ্য হবে, যখন তারা নিজেদের সকল ঝগড়া-বিবাদে রসূলুল্লাহ স. এর ফয়সালাকে মেনে নেবে, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং সব বিষয়ে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেবে।

হাদীস শরীফেও এ সম্পর্কে নির্দেশনা এসেছে। রসূলুল্লাহ স. স্বয়ং সাহাবী মু'আয রা. কে ইয়ামানের কাযী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। যখন তিনি তাঁকে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন: তোমার সামনে কোন সমস্যা উপস্থিত হলে তুমি কি করবে? তিনি বললেন: আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। তিনি বললেন: তুমি যদি আল্লাহ্র কিতাবে এর সমাধান না পাও, তাহলে কি করবে? তিনি জবাবে বললেন: রসূল স. এর সুন্নত অনুযায়ী সমাধান করব। রসূলুল্লাহ স. আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যদি এর ফয়সালা আল্লাহ্র রাসূল সা. এর সুন্নতেও না পাও, তাহলে কি করবে? তিনি বললেন: আমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং এ ব্যাপারে আমি কোন অবহেলা করব না। তখন রসূলুল্লাহ স. তাঁর বুকে হাত রেখে বললেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য যিনি তাঁর রসূল স. এর দূতকে এমন বিষয়ে তাওফীক দান করেছেন, যদ্বারা সে আল্লাহ্র রসূল স. কে সন্তুষ্ট করে দিয়েছে।[১২]

উক্ত হাদীস বিচারকার্যের গুরুত্বের বড় দলীল। রসূলুল্লাহ স. মু'আয রা. কে ইয়ামানের ক্বাযী হিসেবেই প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে প্রেরণের পূর্বে বিচারকার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও শিক্ষাদান করেছিলেন। এ সম্পর্কে রসূল স. অপর এক হাদীসে এরশাদ করেছেন, “যখন কোন বিচারক ফয়সালা করে দেয় এবং তাতে

---

১১. আল-কুরআন, ৪ : ৬৫

১২. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : ইজতিহাদুর রাই ফিলকাযা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৪৮৯, হাদীস নং-৩৫৯২

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلاَ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ ».

ইজতিহাদ করে, আর তার ইজতিহাদ যথাযথ প্রমাণিত হয়, তাহলে তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে। আর যখন বিচার করে এবং তাতে ইজতিহাদ করে, আর ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।"[১৩] এ হাদীসে বিচার-ফয়সালা করা এবং তাতে ইজতিহাদ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যদি বিচারকের ইজতিহাদ যথাযথ হয়, তাহলে তিনি দ্বিগুণ প্রতিদান পাবেন। আর যদি তার ইজতিহাদ ভুল হয়, তাহলেও তিনি একগুণ প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, "রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ উপস্থাপন করে থাক। আর সম্ভবত তোমরা একজন অপর জনের উপর যুক্তিতে চতুরতা প্রদর্শন করে থাক। অতঃপর আমি যা শুনি, এর ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা করে থাকি। সুতরাং আমি যদি কারো জন্যে তার ভাইয়ের হক থেকে কোন কিছুর ফয়সালা করে দেই, সে যেন তার থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করে। কেননা আমি তার জন্য এক টুকরো অগ্নির ফয়সালা করে থাকি।"[১৪] এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ স. এর পক্ষ থেকে উম্মতের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ না করে। আর বিচার-ফয়সালা নিজের পক্ষে আসুক বা নিজের বিপক্ষে থাক, সে ব্যাপারে যেন আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করে।

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসসমূহে শুধু বিচারকার্যের সাধারণ নির্দেশনাই দেয়া হয়নি; বরং আল্লাহ্ তাআলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা সে অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তাদেরকে কুরআনে কাফির বা কোথাও ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কাযা বা বিচারকার্যের বিধান

কাযার বিধান তিন ভাগে বিভক্ত;

প্রথমত : শাসক হিসেবে কাযার বা বিচারকার্যের বিধান

জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করা শাসকের অবশ্য কর্তব্য। কেননা কাযা বা বিচারকার্য শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আহমদ

---

১৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-'ইতিসামু বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : আজরুল হাকিম ইজা ইজতাহাদা ফাআসাবা আও আখতায়া, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১-১২, হাদীস নং-৭৩৫২
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

১৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-হিয়াল, অনুচ্ছেদ : ইজা গাদিবা জারিয়াতুন ফাজা'আমা আন্নাহা মাতাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১, হাদীস নং-৬৯৬৭
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৬
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৩

বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

কামরুজ্জামান শামীম*

[সারসংক্ষেপ : আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতিকে এক উৎস তথা আদম আ. ও হাওয়া আ. থেকে নর ও নারীর যুগলের আকারে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি।" তাই মানুষ নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমাজ ও সংসারের উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করে চলেছে। সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় সাধিত হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে নারীরা দেশ ও জাতির খেদমতে বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এমনকি ইসলামী যুগেও যুদ্ধক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা সরাসরি অংশ গ্রহণ করে তাদের কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেছে। বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সফল পদচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষত আরব বিশ্বসহ মুসলিম দেশগুলোতে তারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হচ্ছে। তারা বিচার বিভাগেও মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারকার্যে নারীদের অংশ গ্রহণের অনুমতি আছে কি না? এ নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ইমাম ও আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এ প্রশ্নেরই সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।]

বিচারকার্য

বিচার বাংলা শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, (১) বিবেচনা, যুক্তিপ্রয়োগ, গবেষণা। (২) সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, মীমাংসা, তত্ত্বনির্ণয়, নিষ্পত্তি। (৩) আলোচনা, তর্ক বিতর্ক। (৪) দোষগুণ, অপরাধ ইত্যাদি নির্ণয়, ন্যায়-অন্যায় স্থিরীকরণ, আসামির বিচার ইত্যাদি।[১] ইংরেজিতে এর প্রতি শব্দ "Judgement"। অর্থ- রায়, বিবেচনার প্রক্রিয়া, সুবিবেচনা, শাস্তি, মতামত ইত্যাদি।[২]

আরবি ভাষায় বিচার বুঝাতে "قضاء" (কাযা') শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন, "أقضية" (আক্‌যিয়াতুন)। যেমন বলা হয়, قضى، يقضي، قضاء، (কাযা, ইয়াকযী,

---

* প্রভাষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৮৬৮

২. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত, *ইংরেজি-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৫, পৃ. ৪২০-২১

রহ. বলেছেন, ইমাম বা শাসকের জন্য প্রতিটি প্রদেশে তথা প্রশাসনিক অঞ্চলে একজন করে বিচারক নিযুক্ত করা ওয়াজিব।[১৫] কেননা শাসকগণই জনসাধারণের বিচারিক দায়ভার বহন করে থাকেন। সুতরাং তিনিই এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

দ্বিতীয়ত : সমষ্টিগতভাবে কাযা বা বিচারকার্যের বিধান

সমষ্টিগতভাবে কাযার বা বিচারকার্যের বিধান হচ্ছে ফরযে কিফায়া। বরঞ্চ এটি সমস্ত ফরযে কিফায়ার মধ্যে একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। ইমাম গাযালী রা. কাযাকে জিহাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা মানুষের স্বভাব সর্বদায় মন্দ, অন্যায় কাজের দিকে ধাবমান থাকে। ন্যায় নিষ্ঠার প্রবণতা মানুষের মাঝে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বিজ্ঞ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণে বিরত থাকলে গোনাহগার হবেন। শাসক তাদেরকে দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করতে পারবেন।[১৬]

তৃতীয়ত : ব্যক্তিগতভাবে কাযা বা বিচারকার্যের বিধান

ব্যক্তির অবস্থাভেদে তা কয়েকভাবে বিভক্ত :

১. যারা বিচারকার্যের যোগ্য নয় এই শ্রেণীর ব্যক্তি দু' প্রকার;

 ক. যিনি শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে অবগত নন এবং বিচারকার্যের দায়িত্ব পালনে নিজেকে অক্ষম মনে করেন। তিনি বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণে যোগ্য নন।

 খ. যার বিচারকার্যের পদ্ধতি ও বিষয়সমূহের ব্যাপারে সম্যক ধারণা রয়েছে; কিন্তু নিজে ন্যায়-নিষ্ঠাবান নন। যেমন তিনি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেন বা বিচারকার্যের দায়িত্ব পেলে প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা রয়েছে অথবা মানুষ তার কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তিনিও বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণে যোগ্য নন।

২. যিনি বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণে যোগ্য (অর্থাৎ বিচারকার্যের পদ্ধতি ও বিষয়সমূহের ব্যাপারে সম্যক ধারণা রয়েছে এবং নিজেও ন্যায়-নিষ্ঠাবান) এবং তার ন্যায় অন্য কাউকে পাওয়া যায় না। এ রকম ব্যক্তির জন্য বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ ফরয।

৩. যিনি বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণে যোগ্য এবং তার ন্যায় আরো লোকজন পাওয়া যায়। তার জন্যে বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ। তিনি যদি নিজেকে অন্যের চাইতে বেশি যোগ্য ও সক্ষম মনে করেন, তাহলে এ দায়িত্ব গ্রহণ করা উত্তম। আর যদি তিনি অন্যকে নিজের চাইতে বেশি

---

১৫. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪০৫ হি., খ. ১১, পৃ. ৩৭৪

১৬. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবুল আব্বাস আহমদ আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৪, খ. ৪, পৃ. ৩৭৬

যোগ্য ও সক্ষম মনে করেন, তাহলে তার এ দায়িত্ব গ্রহণ করা মাকরূহ।[১৭] বিভিন্ন হাদীসে বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে হুঁশিয়ারী এসেছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল স. এরশাদ করেন, "যাকে বিচারকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হলো, তাকে ছুঁরি ছাড়াই জবেহ করা হলো।"[১৮] তাই এ মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে সতর্ক থাকতে হবে। আবার অনেক হাদীসে বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এক হাদীসে নবী করীম স. ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ধরনের ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ার নিচে স্থান দেবেন। যখন তার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। প্রথমত: ন্যায়পরায়ণ শাসক। দ্বিতীয়ত: ঐ যুবক যে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের মধ্যে বেড়ে ওঠেছে। তৃতীয়ত: ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে লেগে থাকে। চতুর্থত: ঐ দু'ব্যক্তি যারা একে অন্যকে আল্লাহ্র জন্যই ভালোবেসে পরস্পর একত্রিত হয় এবং পৃথক হয়। পঞ্চমত: ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী ও পদ অধিকারিণী মহিলা যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে আহ্বান করে। কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। ষষ্ঠত: যে ব্যক্তি অতি গোপনে সদকাহ করে যে, তার ডান হাত সদকাহ করলে বাম হাত টের পায় না। সপ্তমত: যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্ তাআলার যিক্র করে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।"[১৯]

ন্যায়পরায়ণ শাসকের তত্ত্বাবধানেই বিচারকার্য পরিচালিত হয়। সুতরাং ন্যায়-নিষ্ঠার মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারলে দুনিয়া ও আখিরাতে বিরাট প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। তাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। যেন মূর্খ ও অযোগ্যরা এ স্থান দখল করে না নিতে পারে।

---

১৭ শাইখ নিজাম ও অন্যান্য, *আল-ফাতওয়া আল হিন্দিয়্যাহ*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাতি লিততিবা' ওয়ান নাশর, ১৯৯১, খ. ৩, পৃ. ৩৬০

১৮. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : ফিত্তালাবিল কাযা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮৮, হাদীস নং ৩৫৭১

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

১৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আযান, অনুচ্ছেদ : মান জালাসা ফিল মাসজিদ ইয়ানতাজিরুস সালাত ওয়া ফাদলিল মাসাজিদ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩, হাদীস নং ৬৬০

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

বিচারকের শর্তাবলি

বিচারকের জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। আর এই শর্তাবলির উপর ভিত্তি করেই বিচারকের যোগ্যতা নির্ণীত হয়। ইমামগণের সর্বসম্মতির ভিত্তিতে এ শর্তগুলো প্রণীত হয়েছে এমন নয়। কতিপয় শর্তের ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেছেন। আবার কিছু বিষয় নিয়ে ইমামদের মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই বিচারকের শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। শর্তাবলি নিম্নরূপঃ

১. মুসলিম হওয়া

বিচারক মুসলিম হতে হবে। কোন অমুসলিম মুসলিমদের বিচার-ফয়সালার দায়িত্ব নিতে পারবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"আর আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদেরকে মু'মিনদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের কোনো সুযোগ দেবেন না।"[২০]

আল্লাহ্ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"মুমিনগণ যেন অন্য মুমিন ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।"[২১] অমুসলিম মুসলিমদের কর্তৃত্বশীল হতে পারে না। বিচারকার্য হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্তৃত্ব। সুতরাং কোন অমুসলিম মুসলমানদের বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রা. এর মতে অমুসলিম বা যিম্মীরা তাদের স্বজাতির বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারবে। আমর বিন আস রা. এর ঘটনা তার এ মতকে সমর্থন করে। তিনি কিবতী বিচারকদেরকে তাদের স্বধর্মীয় লোকদের বিচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হযরত উমর রা. এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি তা অনুমোদন করেন। সম্ভবত এই ধর্মীয় বিচারকার্য মিসরের বাসিন্দাদের মধ্যে ঘটে ছিল। এই ধরনের ঘটনা ছিল অমুসলিম যিম্মীদের প্রতি ইসলামের উদারতার বহিঃপ্রকাশ।[২২]

২. শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকা

বিচারকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা। শরীয়তের বিধানসমূহের পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে বিচারক শরয়ী বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করতে পারবে না। কুরআনে আল্লাহ্

---

২০. আল-কুরআন, ৪ : ১৪১

২১. আল-কুরআন, ৩ : ২৮

২২. মুতামারুল ফিকহিল ইসলামী, *নিজামুল কাযা ফিল ইসলাম*, রিয়াদ : জামিয়াতুল ইমাম প্রকাশনা, ১৯৮৪, পৃ. ১২

তাআলা তার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন।

এরশাদ হচ্ছে,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

"আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।"[২৩]

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক ও বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে বিচার পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। কেননা বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বশীল হতে হবে। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশু নিজের ব্যাপারে নিজেই কর্তৃত্বশীল নয়। তার কাজগুলো তার অভিভাবক সম্পন্ন করে থাকেন।

বিচারককে বোধশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। বোধশক্তির পাশাপাশি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা থাকতে হবে। সুতরাং পাগল ও বিকৃতমস্তিষ্ক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিচারকার্যের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। আল্লামা আল-মাওয়ারদী বলেন, "প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বুঝার জ্ঞান থাকলেই চলবে না, বরং সচরাচর ভ্রান্তি ও গাফলতির উর্ধ্বে ওঠে বিচক্ষণতার সাথে ভাল-মন্দ সঠিকভাবে নির্ণয়ে সক্ষমতা থাকতে হবে।"[২৪]

৪. স্বাধীন হওয়া

সকল ইমামের মতে বিচারক স্বাধীন হওয়া শর্ত। সুতরাং গোলাম বিচারকার্যের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না। কেননা গোলাম নিজের ব্যাপারেই কর্তৃত্বশীল নয়। আল্লামা আল-মাওয়ারদী 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেন, "গোলামের নিজের ব্যাপারে অসম্পূর্ণ কর্তৃত্বশীলতা অন্যের উপর

---

২৩. আল-কুরআন, ৫ : ৪৯

২৪. আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, মিসর : মাতবায়াতুল বাবী আল-হালবী ও আওলাদুহু, ১৯৭৩, পৃ. ৬৫

কর্তৃত্বারোপের অন্তরায়। অধিকন্তু গোলামের সাক্ষ্যও কবুল করা হয় না। সুতরাং অন্যের উপর তার কর্তৃত্ব কার্যকর হবে না।[২৫]

৫. **ন্যায়পরায়ণতা**

অধিকাংশ ইমামের নিকট বিচারক ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। আল-মুগনী কিতাবে বলা হয়েছে, "ফাসিককে দায়িত্ব প্রদান করা জায়িয হবে না এবং এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও জায়িয হবে না, যার মধ্যে এমন ত্রুটি রয়েছে, যার কারণে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না।[২৬]

কেননা আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ণ করে, তবে তা তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"[২৭]

উক্ত আয়াতে ফাসিকের সংবাদ যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যার সংবাদ যাচাই বিহীন গ্রহণ করা যায় না, তাকে বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া বৈধ হবে না। অধিকন্তু ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। তাই তাকে বিচার পদে নিয়োগ করা যাবে না।

৬. **ইজতিহাদ**

ইমামগণ বিচারক মুজতাহিদ হওয়ার শর্ত করেছেন। আর এ মত হচ্ছে ইমাম শাফিয়ী, মালিক ও আহমদ বিন হাম্বাল রহ. এর। তাঁদের মতে, ইজতিহাদ বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বশর্ত। 'হাশিয়াতু কাল্ইউবী ওয়া উমায়রাহ' গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।[২৮] তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, কাযী ফাতওয়ার সত্যায়ণ করে থাকেন। আর মুফতীর জন্যে ফাতওয়া জানা থাকা আবশ্যক। তিনি সাধারণ অনুকরণকারী ব্যক্তি হতে পারেন না। সুতরাং কাযী অগ্রাধিকারভিত্তিতে অনুকরণকারী হতে পারে না।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রা. এর মতে, ইজতিহাদের সক্ষমতা বিচারক নিয়োগ বৈধ হওয়ার পূর্বশর্ত নয়, বরং অগ্রাধিকার পাওয়ার শর্ত। 'আল-

---

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
২৬. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, সৌদী আরব : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ, তা. বি., খ. ৯, পৃ. ৪০
২৭. আল-কুরআন, ৪৯ : ৬
২৮. আল-কাল্ইউবী ওয়া 'উমায়রা, *হাশিয়াতু কাল্ইউবী ওয়া 'উমায়রা*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৪৫০

ফাতাওয়া আল হিন্দিয়াহ' কিতাবে এসেছে, "বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, ইজতিহাদের যোগ্যতা অগ্রাধিকার পাওয়ার শর্ত।"[২৯] হিদায়া গ্রন্থেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী ইমামগণের যুক্তি হচ্ছে, কাযার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিবাদ মীমাংসা করে দেওয়া। আর বিজ্ঞ আলিমদের ফাতওয়া ও অভিমত জেনে বিবাদ মীমাংসা করা যায়। সুতরাং বিচারকের ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকতে হবে, এমনটির প্রয়োজন নেই।

৭. ইন্দ্রিয়সমূহের সুস্থতা

হানাফী, শাফিয়ী ও হাম্বালী ইমামগণের মতে বিচারকের দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি সুস্থ থাকা অপরিহার্য শর্ত। আল্লামা আল-বুহুতী - এর 'শারহু মুনতাহাল ইরাদাত' গ্রন্থে বিচারকের শর্তের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "বিচারককে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। কেননা বধির বাদী-বিবাদীর কথা শুনতে পারে না। দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। কেননা অন্ধ ব্যক্তি ফরিয়াদী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। কেননা বোবা বিচারের রায় ঘোষণা করতে পারে না। অনেক মানুষ তার ইশারাও বুঝতে সক্ষম নয়।"[৩০] মালিকী ইমামগণের অভিমত হচ্ছে, যদি অন্ধ ও বধিরকে বিচারকার্যে নিযুক্ত করা হয় এবং কোন রায় ঘোষণা করে, তাহলে তাদের রায় কার্যকর হবে।[৩১]

৮. লিখার সক্ষমতা থাকা

বিচারকের লিখার সক্ষমতা থাকতে হবে। তবে ইমাম গাযালী রা. এই শর্তটি মানতে নারাজ। আল-ওয়াসীত নামক গ্রন্থে এসেছে, "নিরক্ষর ব্যক্তিকে বিচারকার্যে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। বিশুদ্ধ মতটি হচ্ছে, নিরক্ষর ব্যক্তির দায়িত্ব প্রদান বৈধ হবে। কেননা রসূলুল্লাহ স. উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন। অপর মতটি হচ্ছে, লিখার সক্ষমতা থাকা শর্ত। আর এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত।"[৩২] আল-কারাফী 'আয-যাখীরাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো যে, বিচারক নিরক্ষর হতে পারবে না।"[৩৩] কেননা বিচারক নিরক্ষর হলে ফাতওয়ার কিতাব অধ্যয়ন করে সঠিক বিচার-ফয়সালা করা সম্ভব হবে না। আর বর্তমান যুগে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সুতরাং বিচারককে অবশ্যই লিখার সক্ষমতা থাকতে হবে। এমনকি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট সম্পর্কেও তাঁর

---

২৯. শাইখ নিজাম ও অন্যান্য, *আল-ফাতওয়া আল হিন্দিয়্যাহ*, প্রগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৭
৩০. আল-বুহুতী, *শারহু মুনতাহাল ইরাদাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫
৩১. আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৩, খ. ৭, পৃ. ১৬০
৩২. আল-গাযালী, *আল-ওয়াসীত ফিল মাযহাব*, মিসর : দারুস সালাম, তা. বি., খ. ৭, পৃ. ২৯১
৩৩. আল-কারাফী, *আয-যাখীরাহ*, লেবানন : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি., খ. ৮, পৃ. ১৬

জ্ঞান থাকা উচিত। আর রসূলুল্লাহ স. নিরক্ষর ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে সুরক্ষিত ছিলেন।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"হে রাসূল স.! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"[৩৪]

সুতরাং রাসূল স. এর নিরক্ষর থাকা এ ক্ষেত্রে দলীল হতে পারে না।

৯. **পুরুষ হওয়া**

বিচারক পুরুষ হওয়া শর্ত। এ ব্যাপারে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। আর এ মতপার্থক্যের উপরই নির্ভরশীল নারীর বিচারকার্যে কর্তৃত্বদান। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল ও হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফারের মতে, বিচারক পুরুষ হওয়া শর্ত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফাসহ এ মাযহাবের অন্যান্য ইমামের নিকট সর্বক্ষেত্রে বিচারক পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। ক্ষেত্রবিশেষে নারীও বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এ সম্পর্কীয় আলোচনা সবিস্তারিত নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্ব

বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্ব নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায় :

প্রথম মত

ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল ও হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফারের মতে, বিচারকের জন্য পুরুষ হওয়া পূর্বশর্ত। সুতরাং তাঁদের মতে নারীকে বিচারকার্যে দায়িত্ব প্রদান সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা প্রথমত কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাআলা একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।"[৩৫]

---

৩৪. আল-কুরআন, ৫ : ৬৭
৩৫. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল-মাওয়ারদী 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেচনা এবং রায়ের ক্ষেত্রে পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। সুতরাং পুরুষদের উপর তাদেরকে কর্তৃত্বশীল করা বৈধ নয়।"[৩৬] সুতরাং যদি নারীকে বিচারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তাহলে নারী পুরুষের উপর কর্তৃত্বশীল হয়ে যাবে, যা আয়াতের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত: তারা হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, "পারস্যবাসী তাদের বাদশাহ কিসরার কন্যাকে শাসক নিযুক্ত করলে রাসূল স. বললেন: যে জাতি তাদের শাসনকার্যে কোন নারীকে নিযুক্ত করে, সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না।[৩৭] এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীরা কর্তৃত্বশীল বা শাসনকার্যের অধিকারী নয়। সুতরাং নারীদেরকে শাসনকার্যে নিযুক্ত করা জায়িয হবে না।[৩৮] তৃতীয়ত: ইজমার মাধ্যমেও তারা দলীল উপস্থাপন করেছেন। আর তা হচ্ছে, ইবনে হাযম রা.-এর যুগের পূর্বে সকল আলিম একমত পোষণ করেছেন যে, নারীদের বিচার কার্যের দায়িত্ব প্রদান অবৈধ। আল-মুগনী কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, "খোলাফায়ে রাশিদীন এবং তাঁদের পরবর্তীগণ অনেক পুরুষকে বিচারকার্যে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু কোন নারীকে তাঁরা এ দায়িত্বে নিযুক্ত করেননি।"[৩৯] চতুর্থত: কিয়াস দ্বারাও প্রমাণ করেছেন যে, নারীদের বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদানের অনুমতি নেই। আল-মুগনী কিতাবের বিবরণীতে জানা যায় যে, "মহিলা রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার যোগ্য নয়। এমনকি কোন রাজ্য বা শহরের দায়িত্বেও তাদেরকে নিযুক্ত করা যাবে না।"[৪০] মহিলাদের যেমন মুসলমানদের শাসক হওয়ার অনুমতি নেই, তেমনি বিচারকার্যের দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ারও অনুমতি নেই। অধিকন্তু মহিলারা নামাযে পুরুষের ইমামতি করতে পারে না। তাই বিচারকার্যের দায়িত্বশীলও হতে পারবে না।[৪১] জমহুর উলামায়ে কিরাম যুক্তির সাহায্যেও দলীল পেশ করেছেন। আল-মুগনী কিতাবে বলা হয়েছে যে, "বিচারকের পুরুষদের বৈঠকে বা বিবাদের মজলিসে উপস্থিত হতে হয়। পুরুষদের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতার প্রয়োজন। মহিলারা অবাধে পুরুষের মজলিসে উপস্থিত হতে পারে না এবং তারা পুরুষের তুলনায় স্বল্প

---

৩৬. আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৩৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ : কিতাবুর রাসূল স. ইলা কিসরা ওয়াল কাইসার, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩, হাদীস নং ৪৪২৫

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

৩৮. আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৭-১৬৮

৩৯. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৯

৪০. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর*, প্রাগুক্ত,খ. ১১, পৃ. ৩৮১

৪১. মানসূর, *আস-সুলতাতুল কাযাইয়্যাহ ফিল ইসলাম*, বৈরূত : দারুল জীল, তা. বি., পৃ. ৯১

সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। অন্য দিকে একজন পুরুষবিহীন হাজারো মহিলাও যদি সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না।"[৪২] আর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের কোন বিষয় ভুলে যাওয়ার বিষয়টি খোদ আল্লাহ্ তাআলাই সতর্ক করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

"দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর- যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৪৩]

'আল-মুহায্যাব' গ্রন্থে এসেছে, "বিচারকের বিশেষজ্ঞ আলিম, সাক্ষী ও বাদী-বিবাদীর মজলিসে উপস্থিত হতে হয়। মহিলাদের ব্যাপারে ফিতনার আশংকা থাকার কারণে এ ধরনের মজলিসে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ।"[৪৪] সুতরাং মহিলাদেরকে কোনভাবেই বিচারকার্যে অভিষিক্ত করা যাবে না।

দ্বিতীয় মত

হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফার ব্যতীত অন্য সকলের মতে, হদ্দ এবং কিসাস ব্যতীত সব ধরনের বিচারকার্যে নারীদের দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ। এ মতের প্রবক্তাগণ তাঁদের দাবীর সমর্থনে কুরআনুল কারীমের এ আয়াত পেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ- قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ - قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ - وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ -

"বিলকিস বলল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন। সে বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করে। তারাও এরূপই করবে। আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।"[৪৫]

---

৪২. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৯

৪৩. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

৪৪. আশ-শীরাজী, *আল-মুহায্যাব ফী ফিকহিশ শাফেয়ী*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ২৯১

৪৫. আল-কুরআন, ২৩ : ৩২-৩৫

আলোচ্য আয়াতসমূহে সাবার রাণী বিলকিসের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। রাণী বিলকিস তার পারিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চেয়েছেন। কিন্তু পারিষদবর্গ নিজেদের শক্তি ও কঠোরতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপারটি তার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি তীক্ষ্ণ মেধা ও বিচক্ষণতার দ্বারা দখলদার বাদশাহদের কর্ম সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন এবং উপঢৌকন প্রেরণ করে সুলায়মান আ. এর মনোভাব অনুধাবন করতে চেয়েছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি পারিষদবর্গের উপর কর্তৃত্বশীল এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে দক্ষ ও প্রজ্ঞাবান। এতে প্রতীয়মান হয়, মহিলারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত বিচারকার্যও সম্পাদন করতে পারবে।

তারা তাদের মতের সমর্থনে এভাবেও দলীল উপস্থাপন করেছেন যে, মহিলারা সাক্ষী প্রদানের যোগ্যতা রাখেন। যেমনটি কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

"দু'জন মহিলা, ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর- যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৪৬]

কর্তৃত্বদানের ক্ষেত্রে বিচারকার্য সাক্ষ্যদানের মতই। সুতরাং মহিলারা যেমন হুদুদ এবং কিসাস ব্যতীত সকল ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা রাখেন, তেমনি বিচারকার্যে কর্তৃত্বদানের ক্ষেত্রেও তারা হুদুদ এবং কিসাস ব্যতীত সকল ব্যাপারে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

'আল-হিদায়া' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, "ইমাম আবু হানীফা রা. বলেন: হুদুদ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে মহিলাদেরকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করা বৈধ হবে। কেননা তারা হুদুদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা রাখেন না। সুতরাং হুদুদ এবং কিসাসের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের অযোগ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে তাদেরকে এ দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে বিচারকার্যের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাবে।"[৪৭] 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে এসেছে, "হুদুদ এবং কিসাসের মধ্যে বিচারক নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়া শর্ত। সুতরাং এ দু'টি বিষয় ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে মহিলারা বিচার-ফয়সালা করতে পারবে।"[৪৮] 'বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, "সাধারণত কোন দায়িত্বে কাউকে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। কেননা সাধারণভাবে মহিলারা সকল ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে। কিন্তু মহিলারা হুদুদ এবং কিসাসের ক্ষেত্রে বিচারক নিযুক্ত হতে পারবে না। কারণ এ দু'টি বিষয়ে তারা সাক্ষ্যদানে ক্ষমতা রাখে

---

৪৬. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

৪৭. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, মিসর : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১০৭

৪৮. ইবনুল হুমাম আল-হানাফী, *ফাতহুল কাদীর*, মিসর : মাতবাআতু মুস্তফা আল-বাবীল হালবী ওয়া আওলাদুহু, তা. বি., খ. ৭, পৃ. ২৫৩

না। সুতরাং বিচারকার্যে কর্তৃত্বশীল হওয়ার যোগ্যতা সাক্ষ্যদানের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল।"[৪৯] 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবু হানীফা রা. বলেছেন: "অর্থ-সম্পদ সম্পর্কিত বিষয়াদিতে মহিলারা বিচারক নিযুক্ত হতে পারবে।"[৫০]

তৃতীয় মত

ইমাম ইবনু হাযম আয-যাহিরীর মতে, সাধারণভাবে সকল বিষয়ে মহিলাদেরকে বিচারক নিযুক্ত করা বৈধ। এমনকি হুদুদ এবং কিসাসের মধ্যেও তাদেরকে বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে। কেননা তাঁর নিকট এ দু'টি বিষয়েও মহিলাদের সাক্ষ্য দান বৈধ। মূলত তিনি তাঁর দাবীর সমর্থনে কিয়াসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

ক. তিনি উমর রা. এর আমলের উপরে কিয়াস করে মহিলাদেরকে বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান বৈধ মনে করেন। ইবনু হাযম র. এর আল-মুহাল্লা নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর রা. আশ-শিফা নামক জনৈকা মহিলাকে বাজার তদারকি অর্থাৎ হিসাব সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[৫১] এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উমর রা. এর আশ-শিফাকে হিসাবের দায়িত্ব প্রদানের উপর ভিত্তি করে মহিলাদেরকে বিচারকার্যে দায়িত্ব প্রদান করা শাসকের জন্য বৈধ হবে।

খ. তিনি ফাতওয়া দানের উপর কিয়াস করেও সাধারণভাবে মহিলাদের বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান বৈধ মনে করেন। আল-মুগনী কিতাবে এসেছে, "ইবনে জারীর রা.-এর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পুরুষ হওয়ার শর্ত করেননি। তাই মহিলাদেরকে যেমন ফাতওয়ার দায়িত্ব প্রদান বৈধ; তেমনি বিচার-ফয়সালার দায়িত্ব প্রদানও বৈধ হবে।[৫২]

গ. স্বামীর গৃহে স্ত্রীর কর্তৃত্বের উপর কিয়াস করে তিনি মহিলাদের বিচার-ফয়সালা সমর্থন করেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, "রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেন, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের গৃহের তত্ত্বাবধায়ক। আর এ দায়িত্ব সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫৩] সুতরাং গৃহের কর্তৃত্বশীলতা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য ব্যাপার যথা বিচারকার্যেও তাদের কর্তৃত্বশীলতা সমর্থনযোগ্য।[৫৪]

---

৪৯. আল-কাসানী, *বাদায়েউস সানায়ে'*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩

৫০. ইবনে রুশ্দ আল-কুরতুবী, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৮, খ. ২, পৃ. ৪৬০

৫১. ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা*, বৈরূত : দারুল আফাকিল জাদীদাহ, তা. বি., খ. ৯, পৃ. ৪৩০।

৫২. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৯

৫৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইসতিকরায ওয়াদ দুয়ুন, অনুচ্ছেদ : আল-আব্দু রাইন ফী মালি সায়্যিদিহী ওয়ালা ইয়া'মালু ইল্লা বিইজনিহী, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং ২৪০৯
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ

ইমাম ইবনু হাযম যুক্তির মাধ্যমেও প্রমাণ করেছেন যে, মহিলাদের বিচারকার্য অবৈধ নয়। তাঁর যুক্তি হচ্ছে যে, প্রতিটি বস্তুর মূলনীতি হচ্ছে বৈধ হওয়া, যদি এ ব্যাপারে নিষিদ্ধতার কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়। সুতরাং যে বিবাদ মীমাংসা করার যোগ্যতা রাখে, তাকে ফয়সালার কর্তৃত্ব প্রদান করা বৈধ। আর মহিলারাও বিবাদ মীমাংসা করতে সক্ষম। তাই তাদেরকে বিচারকার্যের কর্তৃত্বদান বৈধ হবে। কেননা যুক্তি প্রমাণ অনুধাবন করতে পারা এবং কোন বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে নারীত্ব কোন প্রতিবন্ধক হতে পারে না।[৫৫]

দালিলিক পর্যালোচনা

বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বে সর্বক্ষেত্রে নারীদের পদচারণা লক্ষণীয়। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হচ্ছে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নির্বাহ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে এমনকি বিচার বিভাগেও নারীদের অংশগ্রহণ বেড়ে চলেছে। ফলে বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্বদানের বিষয়টি আবার আলোচনায় এসেছে। বর্তমান যুগের আলিমদের মাঝেও এ বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে কেউ কেউ কর্তৃত্বদানের বৈধতার বিষয়ে নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে বর্তমান সময়ের মিসরের প্রখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে বৈধতার ব্যাপারে নিজের মতামত পেশ করেছেন। আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভীর মতামত পেশ করার পূর্বে জমহুর উলামার অবৈধতার ব্যাপারে পেশকৃত দলীলগুলোর পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে :

জমহুর উলামার পেশকৃত প্রথম দলীল কুরআনের আয়াত।

আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাআলা একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।"[৫৬]

এখানে কর্তৃত্বশীলতার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্ত্রীকে স্বামীর শিষ্টাচার শিক্ষাদানের কর্তৃত্ব। আর এটি হচ্ছে পারিবারিক কর্তৃত্ব। এই আয়াতের শানে নুযূল থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে, সাহাবী সায়ীদ ইবনে রাবী'র স্ত্রী তার সাথে দুর্ব্যবহার করেন। এতে তিনি স্ত্রীকে চপেটাঘাত করেন। স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ স. এর কাছে এসে স্বামীর ব্যাপার নালিশ করলেন। রাসূল স. স্ত্রীকে প্রহারের দায়ে স্বামীর কাছ থেকে এর বদলা নিতে চাইলেন। তখন সূরা ত্বাহা-এর ১১৪ নং আয়াত নাযিল হলো :

رَعِيَّتِه قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

৫৪. ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৩০

৫৫. মু'তামারুল ফিকহিল ইসলামী, *নিজামুল কাযা ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৫৬. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
"সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্ মহান! আপনার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কুরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।"[৫৭]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে স্ত্রীকে স্বামীর শিষ্টাচার শিক্ষাদানের কর্তৃত্ব উদ্দেশ্য।
জমহুর উলামার নারীদের বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান অবৈধ হওয়ার দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে রসূল স. এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, "যে জাতি তাদের শাসনকার্যে কোন নারীকে নিযুক্ত করে, সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না।"[৫৮] হাদীসে উল্লেখিত বিষয়টি শাসক বা খলীফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে এসেছে, বিচারকার্যের ব্যাপারে নয়।[৫৯]

জমহুর উলামার তৃতীয় দলীল হচ্ছে ইজমা। খোলাফায়ে রাশিদীন কোন নারীকে বিচারকার্যে নিযুক্ত করেননি। কিন্তু মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়িশা রা. হযরত আলী রা. সময়ে সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ঐ বাহিনীতে যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা., তার ছেলে আব্দুল্লাহ্ রা. এবং তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেননি বরং সহযোগিতা করেছিলেন।[৬০] সুতরাং বিচারকার্য সম্পাদন করার তুলনায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

জমহুর উলামা কিয়াসের দ্বারাও সাব্যস্ত করেছিলেন যে, মহিলারা অবাধে পুরুষের মজলিসে উপস্থিত হতে পারে না এবং তারা পুরুষের তুলনায় স্বল্প বিচক্ষণতার অধিকারী হয়ে থাকে। তাই তাদের বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান বৈধ নয়। লক্ষণীয় যে, নারীত্বের কারণে স্বল্প বুদ্ধিমত্তা ও দীনদারীর ব্যাপারটি খিলাফাত বা রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত। এটি শাখা প্রশাখা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে না। কেননা নারীত্বের কারণে ইয়াতীমদের জন্য ওসিয়ত করা বা ওয়াক্ফের তত্ত্বাবধান করা নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং বিচার-ফয়সালার ব্যাপারেও তা নিষিদ্ধ হবে না। আর সভা, সমাবেশে নারীরা অবাধে যেতে পারে না। কিন্তু প্রয়োজনে তাদের যাবার অনুমতি শরীয়ত অনুমোদন করেছে। কেননা বাদী-বিবাদী বা সাক্ষীর প্রয়োজনে তাদের উপস্থিত হতে হবে। সুতরাং বিচারকার্যের প্রয়োজনে তাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ হবে

---

৫৭. আল-কুরআন, ২০ : ১১৪

৫৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ : কিতাবুর রাসূল স. ইলা কিসরা ওয়াল কাইসার, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩, হাদীস নং-৪৪২৫
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ
لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

৫৯. ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, *আলামুল মুওয়াক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন*, বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৩, খ. ২, পৃ. ৩৭৭

৬০. আয্যাহাবী, *আল-কাশীফ*, সিরিয়া : দারুর রাশীদ, ১৯৮৬, খ. ৪, পৃ. ৫১৩

না। অন্যদিকে নারীর ভুলে যাবার বিষয়টি যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেমনটি কুরআনেও উল্লিখিত হয়েছে :

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

"দু'জন মহিলা, ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর- যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৬১]

এ বিষয়টি সাক্ষ্যদানের সাথে সম্পৃক্ত। যা আয়াতের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়। বিচারের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। কেননা বিচারিক বিষয়টি বাদী-বিবাদী ও সাক্ষীর যুক্তি-তর্ক ও সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে এবং শরীয়তের মূলনীতির প্রমাণাদি সাপেক্ষে আগে থেকেই লিপিবদ্ধ থাকবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়ার আশাংকা থাকবে না।

ইউসূফ আল-কারযাভীর অভিমত

আল-জাজিরা চ্যানেলে ২১-০৭-২০১১ তারিখে প্রচারিত "আশ-শারিয়া'হ ওয়াল হায়াত" শিরোনামে একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে এবং "আল-মারআতুল মুসলিমাতু ওয়া দাওরুহাল ইজতিমায়ী ওয়াস সিয়াসী" শিরোনামের একটি আলোচনা সভাতে আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী মহিলাদের বিচারকার্যে দায়িত্ব প্রদানের ব্যাপারে তার মতামত তুলে ধরেন। আলোচনাটি নিম্নরূপ:

বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে যারা বিশেষত পুরুষ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন, তাদের নির্দিষ্ট দলীল কি? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী বলেন, পুরুষ হওয়ার শর্তারোপকারীগণ রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। রাসূল স. ইরশাদ করেছেন, "যে জাতি তাদের শাসনকার্যে কোন নারীকে নিযুক্ত করে, সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না।"[৬২] তাঁরা কাযা বা বিচারকার্যের দায়িত্বকে এক ধরনের কর্তৃত্ব ধরে নিয়েছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, "বিচারকার্যের জন্য পূর্ণ জ্ঞান, মেধা ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন। আর মেয়েরা স্বল্প জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে আবেগপ্রবণ হওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে মেয়েরা বেশি আবেগপ্রবণ থাকে।" তাদের অধিকাংশ দলীলের ভিত্তি অনুমান নির্ভর। এ ক্ষেত্রে কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। অন্যদিকে ইমাম মুহাম্মদ ইবনু হাযম দলীলগুলোর বাহ্যিক অবস্থার বিবেচনা করেছেন এবং নারীদের বিচারকার্যে দায়িত্ব প্রদান অবৈধ হওয়ার কোন অকাট্য প্রমাণ পাননি। সুতরাং তিনি সাধারণভাবে নারীদের বিচারকার্য বৈধ মনে করেন। ইমাম আবূ হানীফা ব্যক্তিগত অবস্থার

---

৬১. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

৬২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ : কিতাবুর রাসূল স. ইলা কিসরা ওয়াল কাইসার, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩, হাদীস নং ৪৪২৫

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

বিষয়াবলীতে বিচারকার্যের দায়িত্ব বৈধ মনে করেন। ইবনু জারীর আত-তাবারী সাধারণভাবে এমনকি অপরাধ বিষয়ক সমস্যাগুলোতেও বিচারকার্য বৈধ মনে করেন। সুতরাং বিষয়টি বিরোধপূর্ণ।

এ ক্ষেত্রে আমাদের মতামত হচ্ছে, বিষয়টির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্তের প্রয়োজন। আরমা মহিলাদের বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন অকাট্য শরয়ী দলীল পাইনি। শায়খ আল-গাযালী রা.-এর মত অনেক ফকীহ্ বিচারকার্যের বৈধতার বিষয়টি সমর্থন করেছেন। কিন্তু আমি বিষয়টি কিছু শর্ত সাপেক্ষে বৈধ মনে করি। কারণ নিষিদ্ধতার ব্যাপারে কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বিচারকার্য অবৈধ হওয়ার প্রবক্তাগণের প্রাসঙ্গিক দলীলসমূহ অনুমান নির্ভর যুক্তির উপর নির্ভরশীল। যেমন তারা বলেছেন, "মহিলারা পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী নয়। অথবা তাদের ধর্মীয় ও জ্ঞানের বিষয়ে অপূর্ণতা রয়েছে।" তারা এ কথাটি একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, "রাসূল স. ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং নারীদের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করলেন। তখন তিনি বললেন, হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা বেশি করে সদকা কর। কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশকে দোযখবাসী হিসেবে দেখেছি। তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি কেন? রাসূল স. বললেন, তোমরা বেশি করে লানত করে থাক এবং স্বামীর অবাধ্যতা কর। আর একজন দৃঢ় প্রত্যয়ী বিচক্ষণ পুরুষের জ্ঞান হরণকারী হিসেবে স্বল্প জ্ঞান ও দীনের অধিকারী তোমাদের চাইতে আর কাউকে দেখিনি। তারা আরয করলেন, আমাদের জ্ঞান ও দীনের স্বল্পতা কি? রাসূলুল্লাহ্ স. জবাবে বললেন, নারীর সাক্ষ্যদান পুরুষের সাক্ষ্যদানের অর্ধেকের সমান নয়? মহিলারা বললেন, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, এটাই নারীর জ্ঞানের স্বল্পতা। আর নারীর যখন মাসিক রক্তস্রাব হয়, তখন সে নামাযও পড়ে না এবং রোযাও রাখে না। তাই নয় কি? তারা বললেন, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, এটাই তোমাদের দীনের স্বল্পতা।[৬৩]

---

৬৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হায়েয, অনুচ্ছেদ : তারকুল হায়িযিস সাওম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬, হাদীস নং-৩০৪

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

এ হাদীসের মধ্যেই জ্ঞানের স্বল্পতার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা মেধা বা প্রজ্ঞার স্বল্পতা নয়। কুরআনেই ধন-সম্পদ সম্পর্কীয় বিষয়াদিতে দু'জন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সমান আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন সাক্ষী রাখা হয়, তখন যেন দু'জন মহিলাকে রাখা হয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

"দু'জন মহিলা, ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর- যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৬৪]

যদি একজন মহিলাকে সাক্ষী রাখা হয়, তাহলে তার বাবা বা স্বামীর বাঁধার কারণে তিনি সাক্ষ্যদানে বিরত থাকতে পারেন। আর যদি দু'জন থাকে, তবে কেউ না কেউ সাক্ষ্য দিবে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অধিকার হতে বঞ্চিত হবে না। পক্ষান্তরে নারীরা পুরুষের তুলনায় স্বল্প মেধা ও জ্ঞানের অধিকারী এমন নয়। কেননা কুরআনে সাবার রাণী বিলকিসের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ইয়ামানের একটি দ্বীপ রাষ্ট্র শাসন করতেন। তিনি স্বীয় রাষ্ট্রকে অত্যন্ত মেধা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও কৌশলের সাথে পরিচালনা করছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কুরআনে এ ঘটনা উল্লেখের পেছনে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনেক নারী রয়েছেন, যারা নিজ দেশ ও জাতির নেতৃত্বদানে সফল হয়েছেন। সুতরাং পারস্যবাসীর কিসরার মেয়েকে শাসক নিযুক্ত করার প্রেক্ষিতে রাসূল স.-এর উক্তিটি সেই একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য। সকল ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। অনেক মহিলা রয়েছেন, যারা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও বিচক্ষণতায় অনেক পুরুষের চেয়ে বেশি পারদর্শী। বর্তমান বিশ্বে বহু দেশে নারীরা অত্যন্ত মেধা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে নিজ দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

পরিশেষে আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর অভিমত হচ্ছে যে, তিনি নারীদের বিচারকার্যে দায়িত্বদানে অবৈধতার ক্ষেত্রে যেমন কোন অকাট্য দলীল পাননি, তেমনি বৈধতার ব্যাপারেও অকাট্য কোন প্রমাণ বা সর্বসম্মত মতামতও পাননি। সুতরাং তিনি তিনটি শর্ত সাপেক্ষে নারীদের বিচারকার্যে দায়িত্ব প্রদান বৈধ মনে করেন। শর্তগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়া। সুতরাং গর্ভবতী কোন মহিলাকে বিচারের দায়িত্ব প্রদান করা, বা ঋতুবতী যে মানসিক চাপে রয়েছে তাকে দায়িত্ব প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই মহিলাদের যখন অভিজ্ঞতা, অনুশীলন ও শারীরিক পরিপক্কতা আসবে এবং

---

৬৪. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

সন্তানরাও বড় হয়ে যাবে যে, তাদের লালন পালনের কোন চাপ থাকবে না; তখন মহিলাদের এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা উচিত।

২. বিচারকার্য পরিচালনা করার মত পরিপূর্ণ যোগ্যতা থাকা। যেমন প্রবল মানসিক শক্তি, পর্যাপ্ত মেধা-জ্ঞান ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া। কেননা আগেকার যুগে মনীষীগণ এ দায়িত্বকে উপেক্ষা করতেন। যেমন আবূ হানীফা রা. কে এ দায়িত্ব প্রদান করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৩. এ শর্তটি নারীর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং এটি সমাজের উন্নতির স্তরের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমার জন্য বলা বৈধ হবে না যে, মহিলারা এমন সমাজের বিচারিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যে সমাজ তাদেরকে গাড়ি চালানোর অনুমতি দিচ্ছে না এবং তাদের ভোটাধিকার দিচ্ছে না। বা সমাজের লোকজনের মতবিরোধে রয়েছে যে, মহিলারা মাদ্‌রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করবে কি না?

এ বৈধতার বিষয়টি ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। বরং নারীর নিজ সত্তা, পরিবার, সমাজ ও ইসলামের কল্যাণ বিবেচনায় প্রযোজ্য হবে।[৬৫]

উপসংহার

নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। নারীর অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে জাহিলী যুগের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অপমানের শৃংখল থেকে মুক্ত করেছে এবং ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করে তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে নারীকে নষ্ট সমাজের ভোগ্যবস্তু ও বাজারের পণ্য সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে। উলঙ্গপনা, নগ্নতা ও বেহায়াপনার এ নারী স্বাধীনতাকে ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম সর্বদায় নারীকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদানে সোচ্চার। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে আজ অবধি নারীরা স্বীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছে। ইসলাম শরীয়তের সীমারেখায় থেকে প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে নারীকে হদ্দ ও কিসাস ছাড়া নারীশিশু ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিচার কাজে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বাধা নেই। যেহেতু বিষয়টি সর্বসম্মত নয়, তাই সর্বক্ষেত্রে সব বিষয়ে নারীকে বিচারিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হলে কাঙ্খিত প্রত্যাশা পূরণে জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। বস্তুত স্ব স্ব ক্ষেত্রে নারী পুরুষ যথাযথভাবে স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিলে একটি সুখী, সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকলের অধিকার সুনিশ্চিত হবে।

---

৬৫. দেখুন, মাওকিউল কারযাভী, শিরোনাম : আল-মারআতু ওয়াল্লুইউ মানসিবিল কাযা। ওয়েব সাইট : http://www.qaradawi.net

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৬
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৩

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর আমলে বিচার ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম*

[**সারসংক্ষেপ :** *কোন সরকার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট বিভাগের একযোগে কাজ করা অত্যাবশ্যক। নচেৎ তা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর মধ্যে বিচার বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। কোন রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব কতটুকু তার মাত্রা নির্ধারণের জন্য এভাবে বলা যেতে পারে যে "রাষ্ট্র বা সরকার মানেই বিচার ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা মানেই সরকার।" একটি রাষ্ট্রের সুশাসন অনেকাংশে বিচার বিভাগের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, আইনের শাসন যেখানে ব্যাহত হয়, সে রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থার সার্বিক অবকাঠামো সহসাই ভেঙ্গে পড়ে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা বিশাল আকার ধারণ করে, রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন বেড়ে যায় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ স. প্রদর্শিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর রা.। তাঁর শাসনামলে বিচার বিভাগ ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। জনগণের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তাদান এবং কল্যাণ, সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উমর রা.-এর ভূমিকা অতুলনীয়। এ জন্য তাঁকে বলা হয়, 'মহাকালের সফল রাষ্ট্রনায়ক, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।' সচেতন মহলের অনুভূতিকে জাগ্রত করার নিমিত্তে নিম্নের প্রবন্ধটিতে উমর রা.-এর আমলে বিচার ব্যবস্থাসহ, ন্যায়বিচারের গুরুত্ব, ইসলামী বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্য, উমর রা.-এর বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।]*

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসের ভিত্তিযুগ হিসেবে পরিচিত খিলাফতে রাশিদা। সে যুগের অর্জনগুলি ছিল সকল অঙ্গনে, সকল ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ। পরবর্তীযুগের মুসলিমগণ দিকনির্দেশনা, উৎসধারা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য সেসব কীর্তির দিকে মুখ ফেরায়।[১] তাঁদের মধ্যে খলীফা উমর রা. ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

* সিনিয়র লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. আবদুলহামিদ আবু সোলায়মান, *দি উম্মাহ এন্ড ইট্‌স সিভিলাইজেশনাল ক্রাইসিস (The Ummah and Its Civilizational Crisis)* আই.আর আল ফারুকী এবং এ.ও. নাসিফ সম্পাদিত,) *সোশ্যাল এন্ড ন্যাচারাল সাইন্স (Social and Natural Science)* গ্রন্থে উদ্ধৃত, জেদ্দা : কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, ১৯৮১, পৃ. ১০৩

উমর রা.-এর খিলাফতকাল ছিল আদর্শ ও বাস্তবতার প্রতীক।[২] তিনি কুরআন ও হাদীসের অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং জনগণের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনা করতেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই জনগণের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না।[৩] জাঁক-জমক ও শান-শওকতের কোন স্থান ছিল না। সাধারণ নাগরিকদের ন্যায় অতি সাধারণ ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। তিনি প্রকাশ্য রাজপথে একাকী চলাফেরা করতেন; কোন দেহরক্ষী তো দূরের কথা, নামে মাত্র পাহারাদারও কেউ ছিল না। প্রতিটি মানুষই অবাধে খলীফার নিকট উপস্থিত হতে পারতেন। বিচার প্রার্থনার জন্য কোন অর্থের প্রয়োজন হত না।[৪] ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গিয়ে কোন ধরনের আপোষ করতেন না। ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিজ আত্মীয়স্বজন থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শাস্তি প্রয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না; এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ ছিল শতভাগ।

ইসলামে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা একমাত্র কল্যাণকর ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা। শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ স. মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সেখানে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং তৎকালীন জাহিলী যুগে একটি সুশীল ও অপরাধমুক্ত সমাজ উপহার দেন। এ ধারা অব্যাহত থাকে খিলাফতে রাশিদার পরবর্তী যুগ পর্যন্ত। বর্তমান মানব সভ্যতায় রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা। আর এ অধিকার ও কর্তব্য পালনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও অস্তিত্ব অপরিহার্য। তাই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[৫]

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

অপরাধীকে দমন করা নয়; বরং অপরাধকে দমন করে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ ফিরিয়ে আনাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মানবরচিত আইনে শুধু শাস্তির বিধানই রাখা হয়েছে বা শাস্তি প্রদানই মুখ্য। কিন্তু ইসলামী আইনে শাস্তিই মুখ্য নয়; বরং মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি পুনঃবিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে

---

২. এস.ওয়াকার আহমাদ হোসাইনী, *প্রিন্সিপালস্ অফ ইনভাইরনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেমস্ প্লানিং ইন ইসলাম (Principles of Environmental Engineering Systems Planning in Islami Culture)*, পিএইচ. ডি. থিসিস, ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৭১, পৃ. ১৩৮

৩. আবদুল রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত*, অনুবাদ : এ কে এম সালেহ উদ্দিন, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), ২০০৮, পৃ. ১০২

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৪০

৫. গাজী শামছুর রহমান, *আইনবিদ্যা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৫৫৫-৫৫৬

চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা, মিথ্যা বলা, রাহাজানি করা, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরানো প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত রাখা এবং এগুলোর প্রতি তাদের মনে ঘৃণা জন্মানোর প্রচেষ্টা করা। সাথে সাথে আত্মার পবিত্রতা সাধন, মন মানসে মলিনতা, শোষণ এবং জৈবিক ও পাশবিক পঙ্কিলতাসমূহ প্রক্ষালন করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করা। এ লক্ষ্য অর্জনে দণ্ড নয়; বরং সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাকেই অগ্রাধিকার দেয়া। হাত, পা ও মাথাকে নত করার আগে মানুষের মনের ব্যকুলতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা। শারীরিক বশ্যতার আগে আত্মার আনুগত্যশীলতাকে উজ্জীবিত করা। কারণ আল্লাহর ভয় যার মনকে বিচলিত করে না, দণ্ডের ভয় তাকে কিভাবে বিচলিত করবে? ইসলামী বিচার ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে দেখা গেছে যে, তৎকালীন সময়ে বিচারকদের দরবারে বিচার প্রার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে কমে যেতে থাকে। এতকিছুর পরও যারা অপরাধে লিপ্ত হয় তাদের জন্য ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক বিষয়সমূহ সংরক্ষণ, সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও অপরাধীকে পবিত্র করা এবং মানবতার কল্যাণকে মানুষের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত করা। সর্বোপরি ইসলামী বিচার ব্যবস্থারও মূল উদ্দেশ্য হলো, 'মানবতার কল্যাণ'।

উমর রা.-এর আমলে বিচার ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশিদীন তাঁর রেখে যাওয়া দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেন এবং বিচার ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠা করেন। যেমন, আবু বকর রা. লোকদের বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করেন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিচারকও নিযুক্ত করেন। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক রা.-কে বাহরাইনের বিচারক নিযুক্ত করেন। উমর রা.-কে প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। অবশ্য এক বছর তাঁর আদালতে কোন মামলা দায়ের হয়নি। উমর রা.-এর আমলে আবু মূসা আশআরী রা.-কে বসরার বিচারক এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ রা.-কে কুফার বিচারক নিযুক্ত করেন। সাথে সাথে বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে উমর রা. আবু মূসা আশআরী রা.-এর উদ্দেশ্যে একটি ফরমান পাঠান যাতে বলা হয়–

"আল্লাহর বান্দা উমর ইবনুল খাত্তাব আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আবু মূসা আশআরীর নামে- আসসালামু আলাইকুম। অতঃপর বিচার একটি অপরিহার্য কর্তব্য ও চির অনুসৃত পন্থা। সুতরাং তোমার নিকট কোন মামলা পেশ করা হলে ভালভাবে বিষয়টি বুঝে নিবে। কারণ সত্য প্রকাশ করে কোন লাভ হয় না, যদি বাস্তবে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়। তোমার দরবারে এবং লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে। যেন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি তোমার নিকট থেকে পক্ষপাতিত্বের আশা না করে এবং কোন দুর্বল ব্যক্তি তোমার সুবিচার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা না করে। কোন অসহায় যেন তোমার ভয়ে ভীত না হয়। ফরিয়াদীর ওপর তার দাবি প্রমাণ করার দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারী আসামীর জন্য শপথ গ্রহণই

যথেষ্ট। মুসলমানদের আপোষ মীমাংসা বৈধ। কিন্তু এমন মীমাংসা নয়, যা বৈধকে অবৈধ করে এবং অবৈধকে বৈধ করে। গতকাল যে বিষয়ে তুমি বিচার করেছ তার পুনর্বিচারে কোন দোষ নেই। আজ আবার নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তুমি সত্যে উপনীত হও, তাহলে নির্দ্বিধায় সত্যের দিকে ফিরে যেতে পারো। কারণ, সত্যই শাশ্বত। কোন বস্তুই তাকে বাতিল করতে পারে না। মনে রেখ, মিথ্যাকে আঁকড়ে থাকার চেয়ে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই অধিক শ্রেয়।

যে সব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহে কোন দিক নির্দেশনা নেই এবং তোমার অন্তর দ্বিধাদ্বন্দ্বে আবর্তিত হতে থাকে সে বিষয়ে ভাল করে বুদ্ধি খাটাও এবং চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাও, অতঃপর জেনে নাও কুরআন ও হাদীসে অনুরূপ কোন দৃষ্টান্ত মেলে কিনা, অতঃপর বিষয়টিকে ঐ দৃষ্টান্তের উপর অনুমান কর। তারপর তোমার মতে যে সমাধান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, তাঁর সন্তুষ্টির অধিকতর নিকটবর্তী এবং সত্যের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল, তা গ্রহণ করো। যে ব্যক্তি তোমার নিকট এসে দাবী করে যে, তার অবস্থানের স্বপক্ষে সত্যতা রয়েছে, তবে ঐ মুহূর্তে প্রমাণ পেশ করতে সে অক্ষম। এমতাবস্থায় তাকে এতটুকু অবকাশ দাও, যেন সে প্রমাণ উপস্থিত করতে সক্ষম হয়। ইতোমধ্যে সে যদি তার প্রমাণ উপস্থিত করে তবে তার ভিত্তিতে সে তার হক আদায় করে নেবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করতে তোমার কোন বাধা নেই। এতে করে তার আপত্তি পেশ করারও কোন সুযোগ থাকবে না। বরং তার অদূরদর্শিতা প্রমাণিত হবে।

মুসলিমরা ন্যায়পরায়ণ। তাদের একের সাক্ষী অপরের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য। অবশ্য শরীআতের বিধানমতে শাস্তিপ্রাপ্ত, মিথ্যা সাক্ষ্যদানে অভ্যস্ত এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম। মানুষের গোপন বিষয়গুলোর দায়দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা নিজের উপর রেখেছেন। তোমার দায়িত্ব শুধু উপস্থিত প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা প্রদান করা। স্পষ্ট ও সুদৃঢ় প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তিমূলক শপথ ব্যতীত হদ্দ বা বিধিবদ্ধ দণ্ড প্রদান করা যায় না। আল্লাহ্ এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে হদ্দ জারীর কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আদালত কক্ষে ক্রোধ, সংকীর্ণতা ও অস্থিরতা থেকে নিজেকে রক্ষা কর। লোকেরা মামলা নিয়ে এলে কষ্ট ও বিরক্তিবোধ করো না। কেননা এটাই তো সত্যকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার স্থান। একাজে তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট বিরাট পুরস্কার আর পরকালের উত্তম সঞ্চয়।"[৬]

নাফি রা. বলেন, উমর রা. যায়িদ ইব্‌ন সাবিত রা.-কে বিচারক পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর বেতন নির্ধারণ করেন। একবার উমর রা. ও উবাই ইব্‌ন কা'ব রা.-এর মধ্যে একটি বাগান নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। তাঁরা উভয়ে যায়েদ ইব্‌ন সাবিত রা.-এর নিকট উপস্থিত হলেন। উমর রা. বললেন, উভয় পক্ষকেই বিচারকের কক্ষে

---

৬. আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালদুন, *আল-মুকাদ্দামা*, বৈরুত : দারুল হাদীস, ২০০০, খ. ১, পৃ. ৮২

হাজির হওয়া জরুরী। যায়েদ ইব্‌ন সাবিত রা. তাঁর জায়গা হতে সরে গিয়ে উমর রা.-কে সেখানে বসতে অনুরোধ জানালেন। উমর রা. বললেন, যায়েদ, তুমিতো শুরুতেই অবিচার করলে। তুমি আমাকে আমার সঙ্গীর সাথে বসাও। অতঃপর উভয়েই যায়েদ ইব্‌ন সাবিতের সামনে বসলেন। উবাই তাঁর দাবী পেশ করলেন। উমর রা. অস্বীকার করলেন। বিচারক উবায়ের নিকট সাক্ষী তলব করলেন। তিনি বললেন, আমার কোন সাক্ষী নেই। যায়িদ উমর রা.-কে বললেন, আপনাকে শপথ করতে হবে। অতঃপর উবাই রা.-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমীরুল মুমিনীনকে শপথ করতে বাধ্য করো না। উমর রা. যায়েদ ইব্‌ন সাবিত রা.-কে বললেন, তুমি কি সবার মামলা এভাবে ফায়সালা করো? তিনি বললেন, না। তাহলে তুমি অন্যদের মাঝে যেভাবে ফায়সালা করে থাকো, আমাদের মধ্যেও সেভাবেই ফায়সালা করো। তখন যায়েদ ইব্‌ন সাবিত উমর রা.-কে শপথ করার আদেশ দিলেন। উমর রা. বললেন, সেই আল্লাহর শপথ যার মালিকানায় আমার প্রাণ, এ বাগানে উবাইয়ের কোন অধিকার নেই। এভাবে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে গেল।[৭]

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উমর রা. একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেন, যা বিচারকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি উত্তম উদাহরণ। তা হলো, "যতক্ষণ যায়িদের কাছে একজন সাধারণ মুসলিম এবং উমর সমান না হয়, ততক্ষণ যায়িদ বিচারক পদের যোগ্য হতে পারে না।"[৮]

উমর রা. নিয়োগের পূর্বে বিচারকদের ন্যায়নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ভালভাবে যাচাই করে নিতেন এবং নিয়োগের পরেও কর্মতৎপরতা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। বিচারকদের জন্য যুক্তিসঙ্গত বেতন নির্ধারণ করতেন। জনগণের প্রতি সাধারণ নির্দেশ ছিল, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও বিচারকদের দ্বারা কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে আমাকে নির্ভয়ে তা জানাতে হবে।[৯]

উমর রা.-এর বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. বিচার ব্যবস্থার যে ঘরটি পুরোপুরি নির্মাণ করে গেলেন আবু বকর রা. কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই ঠিক রাসূলুল্লাহ স.-এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সব কিছু পরিচালনা করেন। কিন্তু ইসলামী সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রশাসনিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টির প্রয়োজনিয়তা অনুভূত হতে থাকে। উমর রা. এগুলো সৃষ্টি করেন। বিচার বিভাগের প্রচলিত স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে তিনি সর্বপ্রথম নিজের উপর প্রয়োগ করে এর বাস্তবতা প্রমাণ করেন। এ জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে উমর রা.-এর বিচার ব্যবস্থা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

---

৭. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, মিসর, ১৩৩১ হি., খ. ২২, পৃ. ৭৪

৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১, পৃ. ১৫৫। দ্র: ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, তা.বি., খ. ১০, পৃ. ১৩৬

৯. সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *তারীখে ইসলাম*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ৫৯

১. **বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ** : আবু বকর রা. উমর রা.-কে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে দেন। উমর রা. সেটাকে যথারীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন এবং নিজে আদালতের কাঠগড়ায় হাজির হয়ে শাসন বিভাগের উপর বিচার বিভাগের প্রাধান্য কার্যত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরে মুসলমানদের সমগ্র ইতিহাসে এ ব্যবস্থাই বহাল থাকে।[১০] বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইব্‌ন খালদুন বলেন, খলীফা উমর রা.-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করেন এবং সর্বত্র ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেন।[১১]

২. **বিচার বিভাগকে প্রাধান্য দান** : উমর রা. বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করে দেন। এজন্য প্রত্যেক শহরেই স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন বিচারপতি বা কাজী নিয়োগ করেন। বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগের কর্তৃত্ব হতে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল।[১২] বিচার বিভাগ সাধারণ নাগরিকের অধিকারসমূহের হেফাজতকারী। তাই তিনি অন্যান্য বিভাগের চেয়ে বিচার বিভাগকে প্রাধান্য দেন।[১৩]

৩. **কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা** : শাসন বিভাগ কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারত না এবং আইন বিভাগ কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন আইন প্রণয়ন করতে পারত না।[১৪] উমর রা. বিচারপতি শুরাইহ্ রহ.-এর উদ্দেশ্যে লিখেন :

"তোমার কাছে যখন কোন বিষয় (মামলা) উপস্থিত হয় তখন তুমি সর্বাগ্রে দেখবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনে কী আছে এবং সে মুতাবিক বিচার-ফায়সালা করবে। আর যদি তাতে কিছু না পাও তাহলে দেখবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স. কীভাবে ফায়সালা করতেন এবং তদনুযায়ী ফায়সালা দিবে। ইচ্ছা করলে তুমি আমার সাথে পরামর্শ করে নিতে পারো। আর পরামর্শ করে নেয়ার ভেতরেই আমি কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তোমার প্রতি শান্তি নাযিল করুন।"[১৫]

মূলত তাঁর যুগে বিচার করার সময় বিচারকদের কুরআনের নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হত। কুরআনের আওতাবহির্ভূত ব্যাপারে তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করতে হত।[১৬]

---

১০. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ২৭২
১১. আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১
১২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
১৩. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
১৪. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, ১৯৩
১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ আল-ওয়াকী, *আখবারুল কুযাত*, বৈরূত : তা.বি., খ.১, পৃ. ১৮৯
১৬. কে. আলী, *হিস্ট্রি অফ ইসলাম (History of Islam)*, ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, মার্চ ২০১২, পৃ. ১৫৭

৪. **কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিচারক নিয়োগ দান** : কুরআন ও সুন্নাহ সম্বন্ধে যে সমস্ত মুসলিমের জ্ঞান ছিল এবং যাঁদের সততা সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না, তাঁদের মধ্য হতে খলীফা নিজেই মজলিসুশ শূরা'র সম্মতি নিয়ে কাজী বা বিচারক নিযুক্ত করতেন।[১৭]

৫. **ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা** : যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল না, সেখানে বিচারকদের ইজমা বা জ্ঞানীগুণী মুসলিমদের সম্মিলিত মতামত অনুযায়ী বিচার করতে হত। আর যেখানে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমারও কোন উল্লেখ ছিল না, এমন ক্ষেত্রে তাঁদেরকে কিয়াস বা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে বলা হত। কেননা কুরআন ও হাদীস দ্বারা ইজমার গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা প্রমাণিত;[১৮] অনুরূপভাবে উদ্ভূত কোন বিষয়ের সমাধান কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় পাওয়া না গেলে সে বিষয়ে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়ে।[১৯]

৬. **আদালতের মাধ্যমে জবাবদিহিতা** : উমর রা.-এর আমলে রাষ্ট্রপ্রধানকে (খলীফা) আদালতের নিকট জবাবদিহি থেকে বাঁচার কোন রক্ষাকবচ ছিল না। একজন সাধারণ নাগরিকের মতই তাঁকে আদালতে তলব করা হতো এবং একজন সাধারণ নাগরিক তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারত। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'একবার খলীফাতুল মুসলিমীন উমর রা. এবং উবাই ইব্ন কা'ব রা.-এর মাঝে কোন বিষয় নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। উবাই ইব্ন কা'ব রা. মদীনার বিচারক যায়িদ ইব্ন সাবিত রা.-এর আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। আদালত থেকে উমর রা.-কে হাজির হওয়ার সমন জারী করা হল। তিনি যথাসময়ে হাজির হলেন। কিন্তু বাদী-বিবাদী কারো কাছেই সাক্ষী ছিল না। আইন অনুসারে আদালতের সামনে উমর রা.-এর শপথ করার কথা। উবাই রা. দেখলেন, উমর শপথ করতে প্রস্তুত, তখন তিনি তাঁর অভিযোগ তুলে নেন।[২০]

৭. **বিচারকদের জন্য উচ্চ বেতন নির্ধারণ** : বিচারকদের দুর্নীতি, ঘুষ ও প্রলোভন থেকে দূরে রাখার জন্য যোগ্যতানুসারে উচ্চহারে বেতন দেয়া হতো এবং নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য খলীফা উমর রা. সকল প্রকার আশ্বাস দিতেন। এছাড়া বিচারকদের বসবাসের জন্য বহু সরকারী ভবন নির্মাণ করেন।[২১]

---

১৭. প্রাগুক্ত
১৮. *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
২০. সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৭৪
২১. সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৮. **বিচারকদের আদল ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রদান :** খলীফা উমর রা. যখন কাউকে কোথাও বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতেন, তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, তারা যেন লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার কায়েম করেন, জ্ঞান খাটিয়ে রায় দেন এবং উভয় পক্ষের মতামত শুনে ফায়সালা দেন। তিনি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কখনো কখনো পত্র লিখতেন। যেমন মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আ'স রা.-এর প্রতি পত্র লিখেন। ন্যায়বিচার না করায় কখনো বিচারকদের পদচ্যুত করতেন। যেমন-আবু মারয়াম আল-হানাফীকে কূফার বিচারক পদ থেকে পদচ্যুত করেন।[২২]

৯. **বিচার ব্যবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তি অর্জন :** সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইরানের খসরু এবং রোমের সিজার অপেক্ষা ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও উমর রা.-এর কোন দারোয়ান বা দেহরক্ষী ছিল না। প্রায়ই বিদেশী দর্শক এসে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতেন, "খলীফা কোথায়?" তিনি জেনে বিস্মিত হতেন যে, খলীফা তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।[২৩] সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, 'যতদিন ইসলামী খেলাফত টিকে ছিল কোন খলীফাই ন্যায়বিচারের জন্য গঠিত আদালতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারতেন না কিংবা তার বিপরীতে কাজ করতে পারতেন না।'[২৪]

১০. **বিনা বিচারে আটক নিষিদ্ধকরণ :** উমর রা.-এর আমলে ইরাক থেকে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি যার না আছে আগা, না আছে গোড়া। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা আবার কী? সে বলল, আমাদের দেশে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের হার বেড়েই চলছে। উমর রা. অবাক বিস্ময়ে বললেন, "কী বল, এই জিনিস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে!" সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, "তুমি নিশ্চিত থাক, আল্লাহর শপথ! ইসলামী রাষ্ট্রে কাউকে বিনা বিচারে আটক করা যায় না।"[২৫] মূলত ইসলামে উপযুক্ত বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন সরকার কোন নাগরিককে শাস্তি দিতে পারে না, আর না পারে তাকে বন্দী করে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে। কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ। "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা করবে।"[২৬]

---

২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ আল-ওয়াকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭০

২৩. কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

২৪. সৈয়দ আমীর আলী, *দি স্প্রিট অফ ইসলাম এন্ড এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ্যা সারাসিন্‌স (The Sprit of Islam and a short History of the Serasins)*, ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, পৃ. ২৫৮

২৫. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

২৬. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

১১. **বিচারের বিবরণ শুনানী ও রায়দানের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রতিষ্ঠাকরণ** : উমর রা.-এর শাসনামলে একজন বিচারককে বিচারকার্য পরিচালনাকালে কিছু বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হত। যেমন- এ প্রসঙ্গে নবী স.-এর হাদীস এবং বিচারপতিগণের উদ্দেশ্যে লিখিত উমর রা.-এর পত্র থেকে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো :

"বিচারক শান্ত মেজাজে ও গভীর মনোযোগ সহকারে মামলার বিবরণ শ্রবণ করবেন, যেন রায় প্রদানের সময় তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হন। বাদী-বিবাদীকে তাঁর ডানে বামে না বসিয়ে সম্মুখে বসাবেন এবং কোন পক্ষের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকবেন। তিনি সাক্ষীদের সাথে এমন আচরণ করবেন না যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যথার্থ সাক্ষ্য প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং মামলার পক্ষদ্বয়ের কারো সাথেই অনুরূপ আচরণ করবেন না। তিনি কর্কশভাষী, নিষ্ঠুর বা উৎপীড়ক হবেন না। তিনি আদালতে প্রবেশ করে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষকেই সালাম দিবেন। প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে, কোন পক্ষ কর্তৃক প্রভাবিত বা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অথবা অপরের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক মামলার রায় প্রদান করবেন না। রায় ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত একান্তভাবেই তা গোপন রাখবেন। বিচারকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত আদালতে অন্য সকল কাজ হতে বিরত থাকবেন। ক্রোধান্বিত অবস্থায়, ক্ষুধার্ত অবস্থায়, রাগান্বিত অবস্থায়, ঘুমের আবেশ জড়িত অবস্থায়, তীব্র শীত কিংবা প্রচণ্ড গরম অনুভূত হওয়া অবস্থায়, ব্যক্তিগত কিংবা অন্য কোন কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা করবেন না। অর্থাৎ যতক্ষণ তিনি শান্তমনে নিবিষ্টচিত্তে বিচারকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করবেন এবং বিরক্তি বা শ্রান্তিবোধ হলে বিচারকার্য মুলতবী করবেন। কারো নিকট থেকে উপহারাদি গ্রহণ করবেন না। বাদী বিবাদীর আহারের দাওয়াত কবুল করবেন না। একনিষ্ঠভাবে শরীয়তের অনুসরণ করবেন।"

১২. **কেন্দ্রে খলীফা স্বয়ং কাজীর দায়িত্ব পালন করতেন** : আল্লাহর বাণী

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে। এটি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।"[২৭]

অত্র আয়াতের আলোকে উমর রা. কাজী শুরায়হ্-এর নামে একখানা ফরমান লিখলেন, "বিচার সভায় দর কষাকষি করবে না, কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না। কোন ধরনের বেচাকেনা করবে না এবং তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবে না।"[২৮]

মাঝে মাঝে উমর রা. নিজেই কেন্দ্রীয় বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন।

---

২৭. আল-কুরআন, ৫ : ৮

২৮. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

১৩. **প্রদেশে প্রাদেশিক বিচারপতি নিয়োগ করণ :** পূর্বে বিচার বিভাগের কার্যাবলি গভর্নর নিজেই সম্পাদন করতেন। উমর রা. বিচার ব্যবস্থা বিচারপতির উপর ন্যস্ত করেন। ফলে বিচারপতির উপর প্রাদেশিক শাসনকর্তার (গভর্নর) কোন ধরনের কর্তৃত্ব থাকত না। প্রাদেশিক বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কোন কোন সময় উসমান রা., আলী রা., আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ রা. ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল রা. প্রমুখ সাহাবীকে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন।

১৪. **প্রতিটি জেলায় বিচার আদালত স্থাপন :** উমর রা. রাষ্ট্রের সব জেলাতে বিচারালয় স্থাপন করেন। বিচারকের বেতন নির্ধারণ করেন। বিচার বিভাগের নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বিধিবদ্ধ করেন। ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে উঁচু-নীচু, আপন-পর, বাদশা-ফকীর, সাদা-কালো সবার জন্য একই আইনের ব্যবস্থা করেন। আদালতের আঙ্গিনা মুসলিম ও অমুসলিম সবার জন্য খোলা ছিল।[২৯]

১৫. **জেলায় জেলা বিচারপতি নিয়োগ দান :** নবী সা., খোলাফায়ে রাশিদীন এবং তৎপরবর্তী মুসলিম শাসকগণের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় সংগঠন প্রধানত তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল; শাসন বিভাগ, সামরিক বিভাগ ও বিচার বিভাগ। পরবর্তীকালে সামরিক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগ করেন এবং প্রতিটি জেলায় জেলা-বিচারপতি নিযুক্ত করেন।

১৬. **কখনো কখনো ক্ষমতা রহিত করে স্বপদে বহাল রাখতেন :** যেমন-উবাদা ইব্‌নুস সামিত রা. ইস্যুতে উমর রা. মু'আবিয়া রা.-এর ব্যাপারে এরূপ করেছিলেন। ইব্‌ন আব্দুল বার রহ. বলেন, ইমাম আওযায়ী রহ. বলেছেন, উবাদা ইব্‌নুস সামিত রা. ফিলিস্তীনের বিচারক ও গভর্নর ছিলেন। মু'আবিয়া রা. কোন এক ব্যাপারে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং বিরোধিতা করেন। উবাদা রা. তাকে বললেন, 'আমি আপনার সাথে এক ভূখণ্ডে থাকবো না'-এ কথা বলে তিনি মদীনায় চলে আসেন। উমর রা. তাঁর মদীনায় ফিরে আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা অবহিত করেন। তিনি তাকে পুনরায় ফিলিস্তিনে প্রেরণকালে বললেন, যে ভূখণ্ডে তুমি থাকবে না তাদের আল্লাহ্ নিপাত করুন, ঐ ভূখণ্ডে তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। অতঃপর তিনি মু'আবিয়া রা.-এর নিকট পত্র লিখেন।[৩০]

১৭. **বিচারকদেরকে খলীফা উমর রা. স্বয়ং নিয়োগ করতেন : মজলিসুশ** শূরার সদস্য, বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার শাসনকর্তা, বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে উমর রা. উক্ত এলাকার জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করতেন। বিচারকদের বা শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে জনগণের কোন অভিযোগ থাকলে তিনি তার প্রতিকার

---

[২৯] সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[৩০] মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ আল-ওয়াকী, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ. ১৮৯

করতেন।[৩১] বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি নিজে বিচারপতি নিযুক্ত করতেন।[৩২]

১৮. **আইনের চোখে সকলেই সমান :** জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান বিবেচিত হত। উমর রা. আবু মূসা আশআরী রা., 'আমর ইবনুল আস রা., তাঁর পুত্র আবু শামাহ্ ও মুহাম্মদ, হিমসের গভর্নর আবদুল্লাহ ইব্‌ন কুরত রা. এবং বাহ্‌রাইনের গভর্নর কুদামা ইব্‌ন মাযউন রা-এর বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান এবং স্বয়ং আপন পুত্র আব্দুর রহমানের উপর হদ্দের শরঈ শাস্তি কার্যকর করে আইনের চোখে সাম্যের এমন উপমা স্থাপন করলেন বিশ্বের ইতিহাসে যার নযীর বিরল।[৩৩] দোষী ব্যক্তি- চাই সে যে কোন বংশের বা যে কোন গোত্রের হোক, খলীফা তাকে উচিত শাস্তিই দিতেন।[৩৪]

১৯. **বিচারালয় হিসেবে মসজিদকে ব্যবহার :** রাসূলুল্লাহ্ স. যেভাবে মসজিদে নববীতে বসে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বিচারকার্যও পরিচালনা করতেন তেমনি উমর রা.ও বিচারালয় হিসেবে মসজিদকে ব্যবহার করতেন।[৩৫]

২০. **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারণ :** উমর রা. তাঁর পুত্রের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। তিনি নিজেকে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে প্রতিপক্ষের সামনে পেশ করেছেন, সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগে গভর্নরদের শাস্তি দিয়েছেন এবং ন্যায়বিচার লাভের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে প্রতিকার প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করেছেন।[৩৬] হজ্জের সময় মক্কায় গিয়ে তিনি বিচারকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা সরাসরি তাঁর নিকট পেশ করার জন্য ঘোষণা দিতেন। এক ব্যক্তি এক বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে অকারণে একশত চাবুকের আঘাত দিয়েছে। উত্তরে উমর রা. বললেন, তুমিও তাকে একশত চাবুক মারবে। সংশ্লিষ্ট বিচারক বলল, 'এরূপ করলে বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা নষ্ট হবে এবং শাসনকার্য অচল হয়ে পড়বে।' উমর রা. বললেন, "এরপরও এরূপ সুবিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন অপরিহার্য, কেননা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ স. এরূপ করেছেন।"[৩৭]

২১. **পক্ষপাতহীন বিচার ব্যবস্থা :** তাঁর আমলে ধনী-দরিদ্র, নিঃস্ব ও ধনাঢ্যের মধ্যে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনগণের মধ্যে একবিন্দু বৈষম্যমূলক আচরণ

---

৩১. কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৩২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
৩৩. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।
৩৪. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ. ১, পৃ. ৩৫৮-৩৬২
৩৫. কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৩৬. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৩৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

প্রদর্শন না করার জন্য দায়িত্বশীল কর্মচারীদের প্রতি তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়ে রাখতেন। তিনি নিজে কোন তোষামোদ ও তারীফ-প্রশংসা পছন্দ করতেন না। মদীনার বিচারালয়ে তিনি বিবাদী হিসেবে উপস্থিত হলে বিচারপতি খলীফার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন। এটি দেখে তিনি বললেন, 'এ মামলায় এটিই তুমি প্রথম অবিচার করলে।'[৩৮]

২২. **কুরআনের বিধান 'কিসাস' কার্যকর করেন :** উমর রা.-এর খিলাফতের সময় একবার হজ্জ করার সময় ভিড়ের মধ্যে আরবের পার্শ্ববর্তী জাবালা নামে এক রাজার চাদর এক দাসের পায়ে জড়িয়ে যায়। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে জাবালা ঐ দাসের গালে চড় মারলেন। লোকটি খলীফা উমর রা.-এর নিকট সুবিচার প্রার্থনা করে নালিশ করে। জাবালাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠানো হলো। অভিযোগ সত্য কিনা জিজ্ঞেস করায় জাবালা দৃঢ় ভাষায় উত্তর দিলেন, 'অভিযোগ সত্য, এই লোকটি আমার চাদর মাড়িয়ে যায় কা'বা ঘরের চত্বরে।' 'কিন্তু কাজটি ইচ্ছাকৃত নয়, ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে'- রুক্ষ স্বরে বাধা দিয়ে বললেন খলীফা উমর রা.। উদ্ধতভাবে জাবালা বললেন, 'তাতে কিছু আসে যায় না,-এ মাসটি যদি পবিত্র হজ্জের মাস না হতো তবে আমি লোকটিকে মেরেই ফেলতাম।' জাবালা ছিলেন ইসলামী সাম্রাজ্যের একজন শক্তিশালী মিত্র ও উমর রা.-এর ব্যক্তিগত বন্ধু। উমর রা. কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর অতি শান্ত ও দৃঢ় স্বরে বললেন, "জাবালা, তুমি তোমার দোষ স্বীকার করেছো। বাদী যদি তোমাকে ক্ষমা না করে তবে আইনানুসারে চড়ের পরিবর্তে সে তোমাকে চড় লাগাবে। গর্বিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন জাবালা, 'কিন্তু আমি যে রাজা আর ও যে একজন দাস।' উত্তরে উমর রা. বললেন, 'তোমরা দু'জনই মুসলিম এবং আল্লাহর চোখে দু'জনই সমান।

২৩. **জনগণকে সমালোচনার অবাধ অধিকার দান :** এজন্য একজন সাধারণ নাগরিকও খলীফার সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র পরোয়ার করতেন না। কেবল পুরুষ নাগরিকগণই নয় নারীসমাজও এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল। স্ত্রীর মোহরানা নির্ধারণ বিষয়ে খলীফা উমরের মতের প্রতিবাদ করে এক মহিলা বলেন,
'হে উমর! আল্লাহকে ভয় কর,' তখন উমর রা. নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি তাঁর মত পরিহার করেন এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী উক্ত মহিলার মত নির্দ্বিধায় মেনে নেন। মূলত এটি ছিল উমর রা.-এর ইনসাফ ও ন্যায়নীতির বহিঃপ্রকাশ।[৩৯]

২৪. **মামলা দায়ের করার জন্য কোর্ট ফী'র ব্যবস্থা ছিল না :** অনায়াসে সুবিচার পাওয়াই ছিল উমর রা.-এর বিচারব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এতে না ছিল কোর্ট ফী, না ছিল উকিলের পারিতোষিক ব্যবস্থা।[৪০]

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
৪০. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

২৫. **অমুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা :** অমুসলিমদের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তাদের নিজস্ব ধর্মগুরু ছিলেন এবং তিনি তাদের ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[৪১]

২৬. **ইনসাফভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা :** তাঁর খিলাফতের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক হলো নিরপেক্ষ, সুবিচার ও পক্ষপাতহীন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। তাঁর ন্যায়বিচার কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর সুবিচারের দ্বার ইহুদী, খৃষ্টান, মাজুসী প্রভৃতি অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও অবারিত ছিল। তিনি কোন এক অমুসলিম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে বলল, 'আমার উপর 'জিযিয়া' ধার্য করা হয়েছে, অথচ আমি একজন গরীব মানুষ।' উমর রা. তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন ও কিছু নগদ সাহায্য করলেন এবং বায়তুল মালের ভারপ্রাপ্তকে লিখলেন, 'এ ধরনের আরো যত 'যিম্মী' গরীব লোক রয়েছে, তাদের সকলের জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দাও।"[৪২]

২৭. **শূরাভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা :** উমর রা.-এর বিচার ব্যবস্থা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সুসংঘবদ্ধ বাস্তব ব্যাখ্যা। নিয়ম ছিল, যেসব রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় সমস্যার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যেতো না, সেগুলো যথারীতি মজলিসে শূরায় পেশ করা হতো এবং সেখানে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।[৪৩]

২৮. **আইন সংস্কারকরণ :** উমর রা. প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু সংস্কার সাধন করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নতুন নীতিমালা ও আইন বিধিবদ্ধ করেছেন। এ জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিধিবদ্ধকৃত এসব নীতিমালা ও আইনকেই 'আউয়ালিয়াতে উমর' বলা হয়।

উমর রা.-এর ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত

উমর রা.-এর যুগ ছিল ন্যায়বিচারের সোনালী যুগ। কেননা তাঁর সময়ে সমাজের সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। ন্যায়বিচারের কারণেই উমর রা.-এর শাসন বিশাল দিগন্তজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিচারের ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থী কোন ধর্মের তাঁর সময়ে সেটি বিবেচ্য বিষয় ছিল না। যেমন : মিসরের অমুসলিম অধিবাসীদের এক ব্যক্তি মদীনায় এসে উমর রা.-এর কাছে মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ফরিয়াদী অভিযোগ করল, আপনার গভর্নরের ছেলে আমার ছেলেকে অন্যায়ভাবে লাঠিপেটা করেছে। উমর রা. এ অভিযোগ শোনামাত্র গভর্নর ও তার

---

৪১. কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৪২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৪৩. সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

ছেলেকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন এবং যথাযথ বিচারের পর ফরিয়াদীর ছেলেকে দিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করালেন এবং সতর্ক বাণী উচ্চারণ করলেন,
"তুমি কবে থেকে মানুষকে গোলাম বানাতে শুরু করলে? অথচ তারা তাদের মায়ের পেট থেকে স্বাধীনভাবে জন্ম গ্রহণ করেছিল।"

নিজ পুত্র বা স্বজন বলে বেশি সুবিধা নিয়ে নেবে উমর রা.-এর যুগে তা চিন্তাও করা যেত না। কেউ তখন এসব নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পেত না। তাঁর খিলাফতকালে খলীফা জুমু'আর খুতবা দিতে মিম্বরে দাঁড়ানোর সাথে সাথে এক মুসল্লী (সালমান ফারসী[৪৪]) জানতে চাইলেন, খলীফার জামা এতো লম্বা হলো কীভাবে? কারণ বায়তুল মাল থেকে সকলকে যে কাপড় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা দিয়ে অত লম্বা জামা বানানো যায় না। প্রশ্নকর্তা যখন জানলেন, খলীফার ছেলের ভাগে যে কাপড় পাওয়া গেছে সেটা খলীফাকে দেয়ার ফলেই তাঁর পক্ষে লম্বা জামা বানানো সম্ভব হয়েছে। তখন প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হ্যাঁ এখন খুতবা শুরু করুন। আমরা শুনবো। খলীফা বললেন, যদি সন্তোষজনক জবাব না পেতে তাহলে কী করতে? তখন প্রশ্নকর্তা বললেন, তখন আমার এই তলোয়ার এর সমাধান দিতো। একথা শুনে খুশী হয়ে খলীফা বললেন, "হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত এরূপ সাচ্চা ঈমানদার বান্দা জীবিত থাকবে, ততদিন ইসলাম ও মুসলিমের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।"[৪৫]

আবু মূসা আশআরী রা. গনীমতের মাল বেশী দাবী করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে বিশটি চাবুক মারিয়েছিলেন এবং তার মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছিলেন। সে ব্যক্তি সরাসরি উমর রা.-এর দরবারে তার মানহানির অভিযোগ করে। অতঃপর উমর রা. লিখিত নির্দেশ পাঠালেন : 'আপনি যদি এ কাজ জনগণের সম্মুখে করে থাকেন তাহলে আপনাকে শপথ করে বলছি যে, অনুরূপভাবে জনগণের সম্মুখেই বসে তার প্রতিবিধান করুন।' লোকেরা ক্ষমা করে দেয়ার জন্য তাঁকে অনেক বুঝালো কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না। পরিশেষে আবু মূসা আশআরী রা. সর্বসাধারণের সামনে প্রতিদান দেওয়ার জন্য বসে যান। তখন সে আকাশপানে মুখ তুলে বলল, হে আল্লাহ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।[৪৬]

বসরার গভর্নর মুগীরা ইব্‌ন শু'বা রা.-এর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে উমর রা. শাস্তির রায় দান করেন এবং তদনুযায়ী তাদের বেত্রাঘাত করা হয়।[৪৭]

---

৪৪. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

৪৫. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, ইসলামের মৌলিক মানবাধিকার, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ : ৪২, সংখ্যা : ৪, এপ্রিল-জুন ২০০৩, পৃ. ৩৬

৪৬. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

৪৭. প্রাগুক্ত

একবার প্রকাশ্য জনসভায় এক ব্যক্তি খলীফা উমর রা.-এর নিকট মামলা দায়ের করল যে, এক কর্মচারি অহেতুক আমাকে একশত বেত্রাঘাত করেছে। এরপর উমর রা. এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, এই জনসভায় উক্ত কর্মচারিকে তুমি একশত বেত্রাঘাত করে প্রতিশোধ নাও। এরূপ কঠোর নির্দেশ শুনে আমর ইবনুল আস রা. দাঁড়িয়ে বললেন, এহেন অবস্থায় কর্মচারিদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিবে। জবাবে উমর রা.বললেন, তাই বলে তো আমি দোষী ব্যক্তিকে শাস্তিদান থেকে বিরত থাকতে পারি না। অতঃপর আমর ইবুনল আস রা. অনুরোধ করে প্রত্যেকটি বেত্রাঘাতের পরিবর্তে দুটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বাদীকে সন্তুষ্ট করেন।[৪৮]

উমর রা. পুরুষদেরকে নারীদের সাথে অবাধে ঘোরাফেরা করতে নিষেধ করেছিলেন। এক ব্যক্তিকে মহিলাদের সাথে নামায পড়তে দেখে তাকে চাবুক লাগালেন। সে বলল, "আল্লাহ্‌র শপথ! এটি যদি আমি ভালো কাজ করে থাকি তাহলে আপনি আমার প্রতি জুলুম করলেন। আর যদি আমি মন্দ কাজ করে থাকি তাহলে আপনি এর আগে আমাকে তা জানান নি।" তিনি বললেন, "তুমি কি আমার নসীহত করার সময় উপস্থিত ছিলে না?" সে বলল, না। উমর রা. তার সামনে চাবুকটি রেখে বললেন, "আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও।" সে বলল, "আজ নিচ্ছি না।" তিনি বললেন, "বেশ তাহলে ক্ষমা করে দাও।" সে বলল, "ক্ষমাও করছি না।" অতঃপর উভয়ই একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। পরদিন সাক্ষাত করে সে উমর রা.-কে মলিন চেহারায় দেখতে পেল। সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! সম্ভবত আমার কথায় আপনি বিব্রতবোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, "আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"[৪৯]
অনুরূপভাবে উমর রা.-এর ন্যায়বিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে, কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে সবগুলো বর্ণনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা বনাম উমর রা.-এর বিচার ব্যবস্থা

বর্তমান বিচারব্যবস্থা ও উমর রা.-এর বিচারব্যবস্থার মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমান প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় আইন কাঠামোয় অস্বচ্ছতা, আইনের সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং বিচার বিভাগের উপর নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্বসহ অসংখ্য জঞ্জাল আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে জনগণ ন্যায়বিচারের পরিবর্তে জুলুমের শিকার এবং বঞ্চিত হচ্ছে। হত্যার অপরাধীও খালাস পেয়ে যায় সহজেই; আবার নিরপরাধ ব্যক্তি বছরের পর বছর কারান্তরীণ হয়ে নির্যাতিত হয়।

---

৪৮. আল্লামা শিবলী নোমানী, *আল-ফারুক*, ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০২, পৃ. ১২৭
৪৯. আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, উর্দূ অনু. পৃ.২২৫

পক্ষান্তরে উমর রা.-এর শাসনামলে বিচার ব্যবস্থায় ছিল সুস্পষ্ট ও ক্রটিমুক্ত আইন-কানুন, নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়া, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠুকাঠামো, বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, দ্রুত বিচার ব্যবস্থা, সহজলভ্য বিচার প্রাপ্তি। বিচারকদের আল্লাহর নিকট ও জনগণের নিকট জবাবদিহিতার ভয় কাজ করত। ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করার ফলে রাষ্ট্রের সকল জনগণ পেত ন্যায় বিচার, সুরক্ষিত ছিল তাদের মৌলিক অধিকার। সে সময়ে ছিল না কোন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব। প্রবাহমান ছিল শান্তির সুশীতল বাতাস।

উপসংহার

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তা হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। ন্যায়বিচার হলো শান্তির চাবিকাঠি। No justice No peace 'ন্যায়বিচার নেই তো শান্তি নেই'। আজকের বিশ্বে অশান্তি, ব্যাপক খুন-খারাবী ও হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ ন্যায়বিচার না থাকা। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধেরকারণে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে। ফলে নিরপরাধ মানুষ নির্যাতিত ও সাজাপ্রাপ্ত হয়। মানুষ হক কথা বলতে ভয় পায়। এর ফলে অপরাধীরা আরো বেপরোয়া হয়ে যায়। বর্তমান সেক্যুলার রাষ্ট্রসমূহে বিনা কারণে গ্রেফতার, বিচারবিহীন সাজা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি, চিহ্নিত সন্ত্রাসীর-অপরাধীরা প্রকাশ্যে দিবালোকে ঘুরে বেড়ানো, বিনা বিচারে প্রতিপক্ষকে হত্যার প্ররোচণা, শ্লীলতা হারিয়ে অনেক তরুণী আর দিনের আলোয় মুখ দেখতে চায় না। এসিডদগ্ধা নারীর মুখে তার ঝলসানো স্বপ্নগুলো ঢাকা পড়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব অপরাধের কোন বিচার হয় না। বিচারের দাবিতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে এক সময় তা অদৃশ্য হয়ে যায়। সুশাসন ও ন্যায়বিচার আজকের সমাজে ডুমুরের ফুল। সভা-সেমিনার, মিটিং-সিটিংয়ে শুধু মৌখিক কিছু নিন্দা প্রস্তাব জানানো, মুখরোচক কিছু বক্তব্য। টাকা দিয়ে বিচারের রায় নিজের মত করিয়ে নেয়া, টাকার বিনিময়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীকে মুক্তি দেয়া, টাকা দিয়ে সত্যকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করা বর্তমান বিশ্বে কোন ব্যাপারই না। আমাদের দেশে অনেক আইন আছে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এসব আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নেই। এজন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আজকের পৃথিবীতে উমরের আদর্শের বাস্তবায়ন খুববেশী প্রয়োজন। যেখানে থাকবে না কোন রেষারেষি, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা। রাতের অন্ধকারে অবলা-নারী নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারবে, কোন বখাটে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখার সাহস করবে না।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৬
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৩

ওসিয়্যাত : ইসলামী শরীয়তের আলোকে একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম*

[**সারসংক্ষেপ :** *ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীতে মানুষের আগমন কিছু কালের জন্য। মৃত্যুই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি । প্রায়ই মানুষ কারো না কারো মৃত্যুর ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। তা সত্ত্বেও সে তার উপর ন্যস্ত বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন থাকে। কিন্তু যখন মৃত্যুর অপ্রতিরোধ্য থাবা তাকে কাবু করে ফেলে, তখন সে অন্তিম মুহূর্তে অস্থির অবস্থায় অনুসন্ধান করে সারা জীবনের দায়িত্ব অবহেলার ক্ষতিপূরণ আদায় করার কোন উপায় আছে কি না। ইসলামী আইনে সেই মুহূর্তে ক্ষতিপূরণ করার একটি মাত্র পথ আছে, তা হলো ওসিয়্যাত। ওসিয়্যাতের মাধ্যমে বিত্তশালী ব্যক্তি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যেমন গরীবের উপকার করতে পারে তেমনি অনেক সময় এর মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সামাজিক কাজও সম্পন্ন করা যায়। সে জন্য ইসলামী শরীয়তে ওসিয়্যাতের আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ নিবন্ধে ওসিয়্যাত সম্পর্কিত ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান উপস্থাপন করা হয়েছে।]*

ওসিয়্যাত-এর শাব্দিক অর্থ

ওসিয়্যাত (وصية) আরবী শব্দ যার অর্থ : উপদেশ, পরামর্শ, সুপারিশ, আদেশ, উইল।[১]

'A Dictionary of Modern Written Arabic' এ ওসিয়্যাতের অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে : Direction, Instruction, Disposition, Injunction, Order, Will, Request.[২]

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এ ওসিয়্যাতের অর্থ করা হয়েছে, ভার অর্পণ, নির্দেশ। পারিভাষিক শব্দ হিসাবে শেষ ইচ্ছা, ইচ্ছাপত্র বা ইচ্ছাপত্র যোগে প্রদত্ত সম্পত্তি।[৩]

'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' গ্রন্থে রয়েছে, ওসিয়্যাত শব্দের অর্থ উপদেশ, মিলানো অর্থাৎ কোন জিনিস অন্যদের পর্যন্ত পৌছানো।[৪]

---

* প্রভাষক (খণ্ডকালীন), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৮২৯

২. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Newyork : Spoken Language Services, Inc., 1976, p. 1075

৩. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১, খ. ১, পৃ. ২৫২

'ফাতাওয়া ও মাসাইল' গ্রন্থে রয়েছে, ওসিয়্যাত শব্দের অর্থ কোন কাজের অঙ্গীকার গ্রহণ করা, নির্দেশ প্রদান করা।[৫]

ওসিয়্যাত-এর পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ওসিয়্যাত বলা হয়, "কাউকে বিনিময়বিহীন কোন কিছুর মালিক বানানো, যা ওসিয়্যাতকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর কার্যকর হবে।"[৬]

'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তি বা এর আয় তার মৃত্যুর পর হতে চিরকালের জন্য অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অপর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই হস্তান্তর করাকে ওসিয়্যাত বলে।[৭]

'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' গ্রন্থে রয়েছে, কোন বস্তু কিংবা তার মুনাফা সম্পর্কে বলে দেয়া অথবা লিখে দেয়া যে, আমার মৃত্যুর পর এটা অমুকের হবে। ইসলামী অনুশাসনে এরূপ অনুরোধকে ওসিয়্যাত বলা হয়।[৮]

ওসিয়্যাতকারীকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'মূসী' (موصي), ওসিয়্যাতকৃত বস্তুকে 'মূসা বিহি' (موصى به) এবং যার অনুকূলে ওসিয়্যাত করা হয়, তাকে 'মূসা লাহু' (موصى له) এবং ওসিয়্যাতকারী ওসিয়্যাতকৃত সম্পত্তি পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি হিসাবে যাকে নিযুক্ত করে তাকে 'ওসী' (وصي) বলে।[৯]

ওসিয়্যাতের শর্তাবলী

ইসলামী শরীয়তে ওসিয়্যাত কার্যকর করার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। ওসিয়্যাত সংক্রান্ত শর্তাবলী নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১. ওসিয়্যাতকারী ব্যক্তি বিনিময়বিহীন দান করার অধিকারী হতে হবে। সুতরাং শিশু বা উন্মাদের ওসিয়্যাত কার্যকর হবে না। শিশু বা উন্মাদের ওসিয়্যাত কার্যকর না হওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তি এই যে, ওসিয়্যাত হচ্ছে স্বেচ্ছাদান আর শিশু স্বেচ্ছাদানের উপযুক্ত নয়। তাছাড়া শিশুর বক্তব্য অবশ্য সাব্যস্তকারী নয়। অথচ তার ওসিয়্যাতকে সিদ্ধতা দানের অর্থ হলো তার বক্তব্যকে অবশ্য সাব্যস্তকারী বলে সিদ্ধান্ত দেয়া।[১০]

---

৪. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৭২৩

৫. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১, খ. ৬, পৃ. ৪৭৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯

৭. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২৩

৮. মাওলানা হিফজুর রহমান, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনুবাদ : মওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০০, পৃ. ২৯৮

৯. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২৩

১০. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবুবকর আল মারগীনানী, *আল হিদায়া*, অনুবাদ : মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ ও মাওলানা ইসহাক ফরিদী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১, খ.৪, পৃ.৫২০

২. যেহেতু মানুষের মৃত্যুর পর ওসিয়্যাত কার্যকর করার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হয়, এ জন্য ওসিয়্যাতকৃত বস্তু ঋণগ্রস্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কেননা দুটি প্রয়োজনের মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে ঋণের বিষয়টি ওসিয়্যাতের চেয়ে অগ্রবর্তী হবে। ঋণ পরিশোধ করা হলো ফরজ আর ওসিয়্যাত হলো স্বেচ্ছাদান, আর সব সময় পর্যায়ক্রমে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারাই কাজ শুরু করা হয়।[১১] কাজেই ঋণগ্রস্ত সম্পদের ওসিয়্যাত সিদ্ধ নয়।

৩. যার জন্য ওসিয়্যাত করা হবে সে ওসিয়্যাতের সময় জীবিত থাকতে হবে। চাই সে প্রকৃত পক্ষে জীবিত হোক অথবা জীবিতের হুকুমে হোক। সুতরাং মাতৃগর্ভের যে সন্তান এখনো রূহ প্রাপ্ত হয়নি, তার জন্য ওসিয়্যাত করা যাবে।[১২] এ ক্ষেত্রে ওসিয়্যাতের সময় মাতৃগর্ভে সন্তানের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হতে হবে এবং ওসিয়্যাত সম্পাদনের ছয় মাসের মধ্যে ভূমিষ্ট হতে হবে। এই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার অনুকূলে কৃত ওসিয়্যাত কার্যকর হবে না।[১৩]

৪. যার জন্য ওসিয়্যাত করা হবে, ওসিয়্যাতকারীর মৃত্যুর সময় সে তার ওয়ারিস হতে পারবে না। অবশ্য এ শর্তটি তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন ওসিয়্যাতকারীর অন্য কোন ওয়ারিস বিদ্যমান থাকে। অন্য কোন ওয়ারিস না থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ওয়ারিস হলেও তার জন্য ওসিয়্যাত করা যাবে। রাসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকের অধিকার যথাযথ ভাবে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং ওয়ারিসগণের জন্য কোন ওসিয়্যাত নেই।"[১৪] ওয়ারিস বিশেষের অনুকূলে ওসিয়্যাত করা হলে অপরাপর ওয়ারিসের স্বার্থহানি ঘটতে পারে। এর ফলে তাদের মধ্যে বিভেদ ও সম্পর্কচ্ছেদ ঘটবে। অথচ উভয়টিই হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ "ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।"[১৫]
এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "কোন একজন নারী বা পুরুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ষাট বছর আমল করল। অতঃপর যখন মৃত্যু উপস্থিত হলো তখন তারা ওসিয়্যাতের ক্ষেত্রে অন্যের অনিষ্ট করলো। তাহলে উভয়ের জন্য জাহান্নাম

---

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯, ৫২০

১২. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯

১৩. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৬

১৪. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ওসায়া, অনুচ্ছেদ : মা জাআ লা ওসিয়্যাতা লি-ওয়াররাছ, কায়রো : দারুল হাদীস, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৪৩৩, হাদীস নং-২১২০; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-২১২০
عَن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّةَ الْوَدَاع : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

১৫. আল কুরআন, ২ : ২১৭

ওয়াজিব হয়ে যাবে।"[১৬] তবে অন্যান্য ওয়ারিস যদি অনুমোদন করে তাহলে ওসিয়্যাত করা যাবে। এই নিষেধাজ্ঞা ছিল তাদের অধিকারের কারণে। সুতরাং তাদের অনুমোদন প্রদানের কারণে তা জায়িয হবে।[১৭]

৫. ওসিয়্যাতকারীর মৃত্যুর পর ওসিয়্যাতকৃত বস্তুটি অপরের মালিকানায় দেওয়ার উপযুক্ত হতে হবে। চাই তা কোন সম্পদ হোক অথবা সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া যায় এমন কোন কিছু হোক আর তা তৎকালে বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।[১৮]
মূসা বিহি বা ওসিয়্যাতকৃত সম্পদ অবশ্যই মূল্যমান সম্পন্ন জিনিস হতে হবে। যেমন কোন মুসলমানের জন্য মদ, শূকর ইত্যাদি মূল্যমান সম্পন্ন জিনিস নয়। সুতরাং এগুলোর ওসিয়্যাত বৈধ নয়।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না।"[১৯]

৬. কোন মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম ব্যক্তির অনুকূলে এবং কোন অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তির অনুকূলে ওসিয়্যাত করতে পারে। প্রথমটির ব্যাপারে কুরআনে এসেছে,

لا يَنهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَم يُقَاتِلُوا كُم فِى الدِّينِ وَلَم يُخرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُم اَن تَبَرُّوهُم وَتُقسِطُوا اِلَيهِم – اِنَّ الله يُحِبُّ المُقسِطِينَ

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন"।[২০]

---

১৬. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ওসায়া, অনুচ্ছেদ : আয-যিরার ফিল ওসিয়্যা, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং-২১১৭; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف) মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-২১১৭

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ».

১৭. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবুবকর আল মারগীনানী, *আল হিদায়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭

১৮. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯, ৪৮০

১৯. আল কুরআন, ২ : ২৬৭

২০. আল কুরআন, ৬০ : ১০৮

আর দ্বিতীয়টির যুক্তি এই যে, যিম্মাচুক্তির মাধ্যমে মুআমালাতের লেনদেনের ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের সমান হয়ে পড়েছে। এ কারণেই জীবদ্দশায় উভয়পক্ষ হতে স্বেচ্ছাদান বৈধ রয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর পরও তাই হবে।

৭. যদি কোন ব্যক্তি একাধিক ওসিয়্যাত করে তাহলে দেখতে হবে যে, ওসিয়্যাতসমূহের সমষ্টি মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি, না সমান সমান। যদি ওসিয়্যাতসমূহের সমষ্টি এক-তৃতীয়াংশ হয়, তাহলে তা ওসিয়্যাতকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই এক তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদের ওসিয়্যাত করা যাবে না। হাদীসে এসেছে– "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে জানতে চাইলো, আমি কি আমার পুরো সম্পত্তি ওসিয়্যাত করতে পারব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. বললেন, না। তারপর আবার বললো, অর্ধেক সম্পত্তি ওসিয়্যাত করতে পারব? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, না। তারপর আবার বললো, আমি কি এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি ওসিয়্যাত করতে পারব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. বললেন, হ্যাঁ। এক-তৃতীয়াংশই অনেক।"[২১]

ওসিয়্যাতের প্রকারভেদ

ওসিয়্যাত চার প্রকার। যথা :

এক : এমন ওসিয়্যাত যা কথা এবং কাজ উভয়ভাবে প্রত্যাহার করা যায়। যেমন- কথার মাধ্যমে প্রত্যাহার যথা- এ কথা বলা যে, আমি ওসিয়্যাত প্রত্যাহার করলাম। কাজের মাধ্যমে প্রত্যাহার যথা- ওসিয়্যাতকৃত বস্তুটি বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে আপন মালিকানা থেকে বের করে দেওয়া।

দুই : এমন ওসিয়্যাত, যা কথা বা কাজ কোন প্রকারেই প্রত্যাহার করা যায় না। যেমন– কেউ আপন গোলামকে শর্তহীনভাবে বলল, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ ও মুক্ত। এ অবস্থায় কোনভাবেই তার এ কথা প্রত্যাহার করা যাবে না।[২২]

তিন : এমন ওসিয়্যাত, যা কথার দ্বারা প্রত্যাহার করা যায় কিন্তু কাজের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা যায় না। যেমন– কারো জন্য এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ সম্পদের ওসিয়্যাত করা। এক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে ওসিয়্যাত প্রত্যাহার করা যায়। কাজের মাধ্যমে করা যায় না, সে যদি মূল সম্পদ থেকে এক-তৃতীয়াংশ

---

২১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ওসিয়্যাহ, অনুচ্ছেদ : আল-ওসিয়্যাতু বিছ-ছুলুছ, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৯৯৭ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ১০৫, হাদীস নং-১৬২৮

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِى النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ « لاَ ». قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ « لاَ ». فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ « نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ».

২২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ওয়াকফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫, পৃ. ৫৬

পৃথক করে তবুও ওসিয়্যাত বাতিল হবে না, বরং অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে তা প্রযোজ্য হবে।

চার : এমন ওসিয়্যাত যা কাজের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা যায়। কিন্তু কথার মাধ্যমে প্রত্যাহার করা যায় না। যেমন– কেউ শর্ত সাপেক্ষে কোন গোলামকে বলল, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ। এই ক্ষেত্রে এই গোলাম বিক্রয় করে দিলে ওসিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে। কোন কথা দ্বারা বাতিল করা যাবে না।[২৩]

শরীয়তের দৃষ্টিতে ওসিয়্যাত

ওসিয়্যাত কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন–

ওয়াজিব : যথা গচ্ছিত রাখা সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার ওসিয়্যাত, অজ্ঞাত ঋণ পরিশোধের ওসিয়্যাত, ছুটে যাওয়া সিয়ামের ফিদয়া ও কাফ্‌ফারা আদায়ের ওসিয়্যাত।[২৪]

মুবাহ্ : যেমন– আত্মীয় ও অপরিচিত বিত্তবান লোকদের জন্য ওসিয়্যাত। এ ধরনের ওসিয়্যাত বৈধ।

মাকরূহ : যেমন– এমন চরিত্রহীন ও অসৎ লোকদের জন্য ওসিয়্যাত করা যেখানে অধিক সম্ভাবনা থাকে যে, সে ব্যক্তি এ অর্থ খারাপ কাজে ব্যয় করবে। তাহলে সে ওসিয়্যাত মাকরূহ।

ওসিয়্যাত যথার্থ ও বৈধ হওয়ার জন্য এর উদ্দেশ্য অবশ্যই শরীয়ত সম্মত হতে হবে। শরীয়ত বিরোধী কোন উদ্দেশ্যে ওসিয়্যাত করা বৈধ নয়। অবৈধ উদ্দেশ্যে ওসিয়্যাত করলে তা কার্যকর হবে না। বরং বাতিল বলে গণ্য হবে।[২৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না।"[২৬]

মুস্তাহাব : উপর্যুক্ত তিন ধরনের ওসিয়্যাত ছাড়া যাবতীয় ওসিয়্যাত মুস্তাহাব। ফকীহগণ কুরআন, হাদীস ও উম্মাতের ইজমার ভিত্তিতে ওসিয়্যাতের কল্যাণের দিকটি বিবেচনা করে ওসিয়্যাতকারীর যাকাত, রোযা, হজ্জ ও অনুরূপ অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য অপূর্ণ না থাকার শর্তে এই মুসতাহাব ওসিয়্যাতকে অনুমোদন দিয়েছেন।

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

২৪. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০

২৫. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৮

২৬. আল কুরআন, ৫ : ২

এখানে একটি বিষয় আলোচনা করা জরুরী, সেটি হলো আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথা মত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়্যাত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল। এটা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য।"[২৭]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যতদিন পর্যন্ত ওয়ারিসগণের অংশ কুরআনের আয়াত দ্বারা নির্ধারিত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত মৃত্যু পথযাত্রী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়্যাত করে যেতেন। অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হতো। নির্দেশটির বিষয়েই এ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত এ আয়াতের দ্বারা ওসিয়্যাত ফরজ বুঝা যায়। অতঃপর ওসিয়্যাত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি 'মীরাস' এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেওয়া হয়েছে।[২৮]

তাফসীরে মাযহারীতে উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ আয়াত অবতীর্ণের পূর্বেই ইসলামের প্রথম যুগে আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়্যাত করা ফরজ ছিল। পরে এ আয়াত রহিত হয়ে যায়। মীরাস সংক্রান্ত আয়াত এ আয়াতকে রহিত করেছে।[২৯] মীরাস সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্প হোক অথবা বেশি হোক। এটা নির্ধারিত অংশ।"[৩০]

তবে আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসিয়্যাত করা মৃত্যু পথযাত্রীর পক্ষে ফরজ বা জরুরী নয়। সে ফরজ রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন বিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে।

---

২৭. আল কুরআন ২ : ১৮০

২৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন*, অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫, খ. ১, পৃ. ৪৮৮

২৯. কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭, খ.১, পৃ. ৪৩০

৩০. আল কুরআন, ৪ : ৭

ওসিয়াতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,
"কোন মুসলিম ব্যক্তির ওসিয়্যাত করার মত সম্পদ থাকলে তার নিজের নিকট ওসিয়্যাতনামা না লিখে দুই রাতও অতিবাহিত করা উচিত নয়।"[৩১]

যে সব কথায় ওসিয়্যাত সাব্যস্ত হয়

'ওয়াকফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার মৃত্যুর পর আমার উকিল, তখন সে ব্যক্তি তার ওসী হয়ে যাবে। আর যদি বলে, তুমি আমার জীবদ্দশায় আমার ওসী, তবে সে উকিল পরিগণিত হবে। আর যদি বলে, তুমি একশ টাকা মজুরি হিসাবে পাবে, এই শর্তে যে তুমি আমার ওসী হবে। তবে শর্ত বাতিল হবে এবং ওসিয়্যাত স্বরূপ সে একশ টাকা পেতে পারে এবং নির্ভরযোগ্য মত অনুসারে সে ওসী হবে।[৩২]

কেউ যদি লোকজনকে ডেকে বলে তোমরা সাক্ষী থাক যে,

انی قد اوصيت لفلان بالف در هم

"আমি অমুকের জন্য এক হাজার টাকা ওসিয়্যাত করছি", তাহলে তা ওসিয়্যাত হিসেবে পরিগণিত হবে।

আর যদি বলে–

اوصيت ان لفلان فی مالی الف در هم

"আমি ওসিয়্যাত করছি, অমুকের জন্য আমার সম্পদে এক হাজার টাকা রয়েছে", তাহলে এ টাকা ওসিয়্যাত নয় বরং স্বীকারোক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।[৩৩]

কেউ যদি ওসিয়্যাত স্বরূপ বলে–

ثلث داری لفلان فانی اجیز ذالك

"আমার বাড়ীর এক-তৃতীয়াংশ অমুকের, আমি তা অনুমোদন করছি", তবে তা ওসিয়্যাত হবে।

আর যদি বলে–

لفلان سدس داری

"অমুক ব্যক্তির জন্য আমার বাড়ির মাঝে এক ষষ্টাংশ রয়েছে", তবে তা স্বীকারোক্তি হবে।

অনুরূপ যদি ওসিয়্যাতের কথা উল্লেখ করে বলে–

لفلان الف در هم من مالی

"অমুক ব্যক্তি আমার সম্পদ থেকে এক হাজার টাকা পাবে", তবে তা ওসিয়্যাত হবে।

---

৩১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ওসিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৪, হাদীস নং-১৬২৭
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِىَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ».

৩২. *ওয়াফক সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৩৩. প্রাগুক্ত

কিন্তু যদি বলে–

لفلان الف درهم فى مالى

"আমার সম্পদে অমুক ব্যক্তির এক হাজার টাকা রয়েছে", তবে তা স্বীকারোক্তি হবে।[৩৪]

আবার কেউ যদি বলে–

دارى هذه لفلان

'আমার এই বাড়িটি অমুকের', এ ক্ষেত্রে যদি ওসিয়্যাত জ্ঞাপক কথার উল্লেখ না থাকে এবং আমার মৃত্যুর পর এ কথা না বলে, তবে তা দান হিসেবে ধর্তব্য হবে। যদি এ দানকারী ব্যক্তির জীবদ্দশায় ঐ ব্যক্তি তা দখল করে নেয়, তবে তা সহীহ হবে। কিন্তু দানকারী ব্যক্তির ওফাতের পর দানের এ কথা বাতিল হয়ে যাবে।
কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি অপরকে বলে 'তুমি আমার ঋণ-পরিশোধ কর', তবে সে ব্যক্তি ওসী হবে। যদি কেউ সুস্থ অথবা অসুস্থ অবস্থায় বলে, 'যদি আমার কোন কিছু হয় তবে অমুক ব্যক্তি এত পাবে', তাহলে তা ওসিয়্যাত হিসেবে ধর্তব্য হবে।

ওসিয়্যাত প্রত্যাহার করণ

ওসিয়্যাতকারীর জন্য ওসিয়্যাত প্রত্যাহার করা ইসলামী আইনে বৈধ। কেননা এটা হলো স্বেচ্ছা দান। যা এখনো পূর্ণতা লাভ করেনি। সুতরাং তা থেকে ফিরে আসা জায়িয হবে। হিবার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। তা ছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, ওসিয়্যাত প্রাপ্ত ব্যক্তির ওসিয়্যাত কবুল করার বিষয়টি ওসিয়্যাতকারীর মৃত্যুর উপর নির্ভর করে। আর ইজাব বা প্রস্তাব কবুল করার আগে তা বাতিল করা যায়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।[৩৫]

ওসিয়্যাতকারী সুস্পষ্ট কথা অথবা কার্যকলাপের মাধ্যমে ওসিয়্যাত প্রত্যাহার করতে পারে। কথার মাধ্যমে প্রত্যাহার হলো যেমন ওসিয়্যাতকারী বলল, "আমি অমুক জিনিস অমুক ব্যক্তির জন্য ওসিয়্যাত করে ছিলাম। এখন অমুক ব্যক্তির পরিবর্তে অমুক ব্যক্তির জন্য ওসিয়্যাত করলাম।" আর কাজের মাধ্যমে প্রত্যাহার হলো যেমন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনুকূলে একটি মূল্যবান গাছের ওসিয়্যাত করলো। পরবর্তীতে সে ঐ গাছ কেটে নিজের গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করল, এমতাবস্থায় তার ওসিয়্যাত প্রত্যাহার হয়ে গেল।

ওসিয়্যাত প্রত্যাহারের ব্যাপারে তিনটি মূলনীতি রয়েছে। যথা–

১. অপরের মালিকানাধীন কোন বস্তুতে যে ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করলে মালিকের মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায়, ওসিয়্যাতকারী ব্যক্তি সে ধরনের কোন পরিবর্তন করলে সে তার ওসিয়্যাত প্রত্যাহার করেছে বলে গণ্য হবে।

---

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৩৫. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবুবকর আল মারগীনানী, *আল হিদায়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২

২. অনুরূপ ওসিয়্যাতকৃত বস্তুর মধ্যে কিছুর সংযোজন, যা দ্বারা মূলবস্তুর মাঝে পরিবর্তন সাধন হয় এবং এ অতিরিক্ত বস্তু ব্যতীত মূলবস্তুটি প্রদান করা সম্ভবপর না হয়, এরূপ সংযোজন করা প্রত্যাহার বলে গণ্য হবে।
৩. ওসিয়্যাতকৃত বস্তুর মাঝে এমন কোন পদক্ষেপ, যা দ্বারা মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায়, তাও প্রত্যাহার হিসেবে ধর্তব্য হবে।[৩৬]

ওসিয়্যাতের অনুকূলে সাক্ষ্য

মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ওসিয়্যাত অস্বীকার করলে তা প্রমাণের জন্য দুই জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পেশ করতে হবে। মত বিরোধের ক্ষেত্রে ওসিয়্যাত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন, দুইজন লোক যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির অনুকূলে এই জিনিসের ওসিয়্যাত করেছে, এবং মূসা লাহুও (যার জন্য ওসিয়্যাত করা হয়েছে) এর দাবী করে তবে ওসিয়্যাত প্রমাণিত হবে।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়্যাত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের (অমুসলিমদের) মধ্য হতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করবে"।[৩৭]
ওসিয়্যাতনামার সত্যতা সাব্যস্ত হলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সাক্ষ্য হলো এর প্রমাণ স্বরূপ।

ওসী নিয়োগ ও ওসীর যোগ্যতা

ওসিয়্যাতকারী ব্যক্তি তার কৃত ওসিয়্যাত সম্পাদন করার দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত করে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ওসী বলা হয়।
যে কোন বিশ্বস্ত, মুসলিম, বালিগ ও সুস্থবুদ্ধির অধিকারী নারী বা পুরুষকে ওসী নিয়োগ করা যায়। তারা ওসিয়্যাতকারীর আত্মীয় হোক বা না হোক, তবে কোন অমুসলিমকে ওসী নিয়োগ করা বৈধ নয়।[৩৮] নিম্নে ওসীর যোগ্যতা ও ওসী নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় বর্ণনা করা হলো :-
প্রথমত : কোন অমুসলিম ব্যক্তি ওসী হতে পারে না।

---

৩৬. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১
৩৭. আল কুরআন, ৫ : ১০৬
৩৮. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪০

কারণ, এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো,

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

"আল্লাহ কখনও মু'মিনদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব করার অধিকার দেননি।"[৩৯]

দ্বিতীয়ত : ওসীর দায়িত্ব পালনে অপারগ ব্যক্তিকে যদি ওসী নিযুক্ত করা হয়, তাহলে কাযী তার সাথে অন্য একজনকে নিয়োগ দিবেন। দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে এবং সহযোগিতা করবে।

তৃতীয়ত : যদি দু'জনকে ওসী নিয়োগ করা হয়, তাহলে একজন অপরজনকে বাদ দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না এবং কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারবে না।

চতুর্থত : মৃত ব্যক্তির ওসিয়্যাত কার্যকর করার এবং তার নিকট অপরের অথবা অপরের নিকট তার প্রাপ্য ঋণ আদায় করার মত কোন যোগ্য ওয়ারিস বা ওসী নিয়োজিত না থাকলে আদালত এর ব্যবস্থাপনার জন্য ওসী নিয়োগ করতে পারে।[৪০]

পঞ্চমত : কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে ওসী নিয়োগ করা যাবে না। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা নেই। বরং তার হাতে সম্পদ ন্যস্ত করলে, সে তা নষ্ট করে ফেলতে পারে। এ বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"যখন তাদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা খুঁজে পাবে, তখন তাদের সম্পদ তাদের কাছে প্রত্যর্পণ কর।"[৪১]

উপসংহার

ওসিয়্যাত পুণ্যলাভের একটি উপায়। ইসলামে ওসিয়্যাত কেবল বৈধই নয়, বরং এটি একটি প্রশংসনীয় কাজ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওসিয়্যাত একটি অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত ছিলো, যদিও পরবর্তীতে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণের ফলে সে বিধান রহিত হয়ে গেছে। ওসিয়্যাত এমন একটি কাজ যা দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পছন্দনীয় কাজে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা যায়। মানুষকে যেহেতু মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই আস্বাদন করতে হবে, সেহেতু তাকে মৃত্যুর সময় এমন কিছু কাজ করে যাওয়া উচিত, যার দ্বারা সমাজের মানুষ উপকৃত হয় এবং পরকালে কঠিন বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট যা মুক্তির ওসীলা হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজের বিত্তশালীদের পরকালীন মুক্তির ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ওসিয়্যাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই নিজের পরকালীন মুক্তি এবং সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য সকলের নিজের সাধ্য এবং ক্ষমতা অনুসারে ওসিয়্যাত করা উচিত।

---

৩৯. আল কুরআন, ৪ : ১৪১

৪০. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলাম আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪০

৪১. আল কুরআন, ৪ : ৬

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

(১) ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত রেজি: নং (DA-6000) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর, (জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

(২) এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার ব্যবসা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পায়।

(৩) জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

(৪) জার্নালে সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি গ্রন্থ পর্যালোচনাও প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক গ্রন্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

লেখকদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়

ক. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ/চাহিদা সৃষ্টি করা ও গণসচেতনতা তৈরি করা;

খ. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি দূর করা;

গ. মুসলিম শাসনামলের ইসলামী আইন ও বিচারের প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা।

২. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখকের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এ জমা দেয়ার পূর্বে কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় প্রকাশিত বা একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন হতে পারবে না। এ শর্ত নিশ্চিত করার জন্যে প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে,

(ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

(খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

(গ) এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

(ঘ) প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন না।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় যা থাকতে হবে

লেখকের পূর্ণ নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ও ডাক ঠিকানা।

৫. সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। এ সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

৬. পাণ্ডুলিপি তৈরি

(ক) প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হতে হবে।

(খ) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে দুই কপি (হার্ড কপি) পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রবন্ধের সফট কপি সেন্টার-এর ই-মেইল (e-mail) ঠিকানায় (islamiclaw_bd@yahoo.com) পাঠাতে হবে।

(গ) কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কী-বোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft office 2000 এবং MS-Word- SutonnyMJ ফন্ট ব্যবহার করে ১৩ পয়েন্টে (ফন্ট সাইজ) পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। লাইন ও প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ডবল স্পেস হবে।

(ঘ) A4 সাইজ কাগজে প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।

(ঙ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং আরবী উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Simplified Arabic/Traditional Arabic ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(চ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক সূত্র (Primary Source) উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) আল-কুরআন-এর TEXT অনুবাদসহ মূল প্রবন্ধে এবং হাদীসের আরবী TEXT প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

(জ) কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে।

(ঝ) উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবী, উর্দু, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) TEXT দিতে হবে। মাধ্যমিক সূত্র (Secondary Source) বর্জনীয়। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে।

(ঞ) প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে রচিত হতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(ট) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তবে লেখক কোনো বিশেষ বানান বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

(ঠ) তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর অধিলিপিতে (Superscipt) সংখ্যা (যেমন : আল-ফিকহ[১]) ব্যবহার করতে হবে। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে।

(ড) মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঢ) ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

(ণ) হাদীস উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে রেফারেন্সে উদ্ধৃত হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাহকীক, বিশেষ করে হাদীসটির শুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মূল্যায়ন দিতে হবে। তাহকীক এর ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(ত) প্রবন্ধে দলীল হিসাবে জাল/বানোয়াট হাদীস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র যেভাবে উল্লেখ করতে হবে

(১) **কুরআন থেকে :** আল-কুরআন, ২ : ১৫।

(২) **হাদীস থেকে :** লেখক/সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), অধ্যায় (ابواب-كتاب) : ..., অনুচ্ছেদ (باب) : ..., প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল, খ....., পৃ....., হাদীস নং-...।
যেমন : ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আস-সালাতু ফিল-খিফাফ, আল-কাহেরা : দারুত তাকওয়া, ২০০১, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং-৩৭৫।

(৩) **অন্যান্য গ্রন্থ থেকে :** লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশকাল, সংস্করণ নং (যদি থাকে), খ...., পৃ....।
যেমন : মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২১।

(৪) **জার্নাল/প্রবন্ধ থেকে :** প্রবন্ধকারের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশনা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বর্ষ : ..., সংখ্যা :..., (প্রকাশ কাল), পৃ.... ।
যেমন : ড. আ ক ম আবদুল কাদের, মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৩১, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২, পৃ. ১৩।

(৫) **দৈনিক পত্রিকা থেকে**
নিবন্ধ থেকে হলে : লেখকের নাম, নিবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম (ইটালিক হবে), তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : মোহাম্মদ আবদুল গফুর, রিমান্ডে দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় প্রসঙ্গ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ১১।
রিপোর্ট বা অন্য কোনো তথ্য হলে : পত্রিকার নাম (ইটালিক), তারিখ ও সাল, পৃ... ।
যেমন : *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ৬।

(৬) **ইন্টারনেট থেকে :** ইন্টারনেট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হলে বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
যেমন www : ilrcbd.org/islami_ain_o_bechar_article.php

অন্যান্য জ্ঞাতব্য

(১) প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না।

(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গণ জার্নালের ২ (দুই) কপি এবং প্রবন্ধের ৫ (পাঁচ) কপি অফপ্রিন্ট বিনামূল্যে পাবেন।

(৩) প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকলে এবং তা যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনে করা হলে উক্ত সমালোচনা জার্নালে প্রকাশ করা হয়।

(৪) প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহিত হলে সম্পাদক ও রিভিউয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধ সংশোধন করে পুনরায় জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা প্রকাশ করা হবে না।

(৫) জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট সেন্টার সংরক্ষণ করবে। প্রবন্ধের লেখক তার প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

(৬) সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।

(৭) জার্নালে প্রকাশের জন্য কোনো প্রবন্ধ প্রেরণের পূর্বে লেখার নিয়ম অনুসরণ পূর্বক তা সাজাতে হবে। অন্যথায় তা বাছাই পর্বেই বাদ যাবে।

(৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কোনো সম্মানী প্রদান করা হয় না।

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় ....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ...

ঠিকানা ঃ...

....

বয়স .... পেশা ....

ফোন/মোবাইল ঃ ....সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে .... টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা...

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

সংস্থার একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।
ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

⇨ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ X ৪ = ৪০০/-
⇨ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ X ৮ = ৮০০/-
⇨ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ X ১২ = ১২০০/-

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষাম্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষাম্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন্স প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্‌হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ই-লাইব্রেরী
ঙ. আইন ওয়েব সাইট

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৩
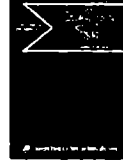
এ সংখ্যার প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক

- ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের ব্যাপ্তি
  ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম
- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজাতিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার স্বরূপ
  ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন
- রসূলুল্লাহ্ স.-এর অবমাননা : পরিণাম ও শাস্তি
  হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল
- দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা / *ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ*
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থা : একটি আইনী পর্যালোচনা
  ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল
- শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে আইনী জটিলতা : ইসলামী সমাধান
  মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
- বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সমস্যা ও সম্ভাবনা : প্রেক্ষিত বীমা আইন-২০১০
  মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪
এপ্রিল-জুন : ২০১৩
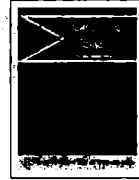
এ সংখ্যার প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক

- শরীয়া' আইনে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি : নীতিমালা ও শর্তাবলি
  মুহাম্মদ রুহুল আমিন
- ইসলামের আলোকে নিষিদ্ধ ব্যবসায় : একটি পর্যালোচনা
  ড. মোঃ মাসুদ আলম
- মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর ও সংযোজন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
  মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান
- ইসলামী আইনে হিবা : একটি পর্যালোচনা
  ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও এ.এন.এম. মাসউদুর রহমান
- ইসলামী ফিক্হ অধ্যয়ন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
  মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ও আবুশিফা মুহাম্মদ শহীদ
- ইসলামে বীমাব্যবস্থা : মৌলভিত্তি ও বাংলাদেশে এর বিস্তার
  মো: অহিদুজ্জামান সরকার ও হাসনা ফেরদৌসী
- ইসলামী আইনে গর্ভপাত : একটি পর্যালোচনা
  তারেক বিন আতিক ও শাহাদাৎ হুসাইন খান

REG. NO. DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: OCTOBER - DECEMBER 2013